উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে ''এ'' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই ১২-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— ''কোর কোর্স'', ''ইলেকটিভ কোর্স'', ''মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স'', ''স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স'', ''এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'' এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National (kills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য,
নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্বার্ষিকি স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম
(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম **(NBG)**

কোর্স : বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (ডিসিপ্লিন স্প্যাসিফিক ইলেকটিভ)

কোর্সের শিরোনাম : ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার

কোর্স কোড : **NEC-BG-03**

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ২০২৫

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission - Distance Education Bureau.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্বার্ষিকি স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম
(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (ডিসিপ্লিন স্প্যাসিফিক ইলেকটিভ)

কোর্সের শিরোনাম : ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার

কোর্স কোড : NEC-BG-03

কোর্স বাংলা স্নাতক পাঠক্রম	কোর্স লেখক Course Writer	কোর্স সম্পাদক Course Editor
মডিউল ঃ ১ ও ২ Module : 1 & 2	**ড. শান্তনু মণ্ডল** সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	**অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল** বিভাগীয় প্রধান বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল ঃ ৩ ও ৪ Module : 3 & 4	**ড. আশিস খাস্তগির** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	

ফরম্যাট এডিটিং:শ্রীসায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ঃ স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি ঃ

ড শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ড নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমন্ত্রিত সদস্য

ড প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র

নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

Netaji Subhas Open University

UG : Bengali (HBG)

NBG
Subject : BENGALI
কোর্স : বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (ডিসিপ্লিন স্প্যাসিফিক ইলেকটিভ)
কোর্সের শিরোনাম : ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার
কোর্স কোড : NEC-BG-03

মডিউল ঃ ১

একক ১	❑ বাংলা ভাষার উদ্ভব	9
একক ২	❑ বাংলা ভাষার বিবর্তন	19
একক ৩	❑ বাংলা উপভাষা	29
একক ৪	❑ শব্দভাণ্ডার	39

মডিউল ঃ ২

একক ৫	❑ বচন লিঙ্গ পুরুষ	47
একক ৬	❑ কারক ও বিভক্তি	53
একক ৭	❑ বাক্যের গঠন	58
একক ৮	❑ বাংলা বানান	63
একক ৯	❑ সাধু ও চলিত ভাষা	69

মডিউল ৩ : বাংলা ছন্দ

একক ১০	❑ বাংলা ছন্দের পরিভাষা	77
একক ১১	❑ বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ	91
একক ১২	❑ বাংলা ছন্দোবন্ধ	198
একক ১৩	❑ বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ	111

মডিউল ৪ : বাংলা অলংকার

একক ১৪	❑	অলঙ্কার কী ও তার প্রকারভেদ	121
একক ১৫	❑	শব্দালংকার	124
একক ১৬	❑	অর্থালংকার	140
একক ১৭	❑	বরোধমূলক অর্থালংকার	167
একক ১৮	❑	অলঙ্কার নির্ণয়	174

মডিউল : ১

একক ১: বাংলা ভাষার উদ্ভব

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা

১.৪ অন্‌-আর্য ও আর্য ভাষা

১.৫ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১.৬ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১.৭ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১.৮ ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব

১.৯ সারসংক্ষেপ

১.১০ অনুশীলনী

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠে ভারতীয় আর্য ভাষাবংশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।
- এই একক পাঠে ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির বিবর্তন সম্পর্কে জানা যাবে।
- এই একক পাঠে অন-আর্য ও আর্য ভাষা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।
- এই একক পাঠে প্রাচীন ভারতীয়, মধ্য-ভারতীয়, নব্য-ভারতীয় আর্যভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য জানা যাবে।

১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বলেই বাংলা ভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির পরিচয় জানা আবশ্যক। এক সময় বাংলাদেশ অনার্য অধ্যুষিত থাকলেও কালক্রমে এখানে আর্য জাতির আগমন ঘটে। আর্যদের আগমনের পূর্বে অঞ্চলভেদে এই অনার্য ভাষা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আর্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন মোটামুটি ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব বলে ধরা হয়। এই সময়ের ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ সময় কাল পর্যন্ত ভাষার যে নমুনা পাওয়া যায় সেই স্তরটিকে প্রাচীন

ভারতীয় আর্যভাষার স্তর বলা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় আর্য ভাষার এই সময়কে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলা হয়। বিভিন্ন শিলালেখ অনুশাসনের স্তর থেকে অপভ্রংশ পর্যন্ত একাধিক ভাষাস্তরের সন্ধান পাওয়া যায় এই সময়কালের মধ্যে।

সবসময় যে সঠিক ভাষিক নমুনা পাওয়া গেছে এমনটা নয়, অনেক সময় অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিকদের। মাগধী অপভ্রংশ, মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষা স্তরে যে একাধিক প্রাকৃত, অপভ্রংশের অস্তিত্ব ছিল সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। এই উপভাষাগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উৎস সন্ধান করা খুব সহজ হয়ে যায়। এই এককের উদ্দেশ্য ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান ও নব্যভারতীয় আর্যভাষা উৎস সন্ধান করা। বাংলাভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় তথা ইন্দো-ইরানীয় তথা ইন্দো-আর্য গোত্রের একটি ভাষা। এই এককে সংক্ষেপে ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে বাংলাভাষার উদ্ভবের একটি পরিচয় পাওয়া যাবে।

১.৩ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা

ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে যতগুলি নাম উঠে এসেছে তার মধ্যে এশিয়ার কিরগিজ্ তৃণভূমির ঊষর অঞ্চলই যে আদি ইন্দো-ইউরোপীয়দের বাসভূমি- এই মতই সব থেকে বেশি সমর্থিত। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সংস্কৃত, গ্রিক ও লাতিনের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আনুমানিক রূপ পুনর্গঠন করা হয়েছে। উইলিয়াম জোন্‌স ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত, জার্মানিক ও কেলতিক ভাষাগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে ভাষাগুলির একটি সাধারণ উৎসের কথা বলেন। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাথমিক ভাবে বিভাজন দুটি—কেন্তুম্ ও শতম্। ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার যে যে ভাষায় তালব্য / ক / ধ্বনির উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকে সেই সমস্ত ভাষাকে 'কেন্তুম্' বলে। যেমন গ্রিক, লাতিন, কেলটিক, জার্মানিক, তুখারীয় এবং হিট্টিয়। আর ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার যে যে ভাষায় তালব্য / কি / ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে / শ / ধ্বনি হয়ে যায় সেই সমস্ত ভাষাকে 'শতম্' বলে। যেমন-বালতো-স্লাভিক, আর্মেনীয় এবং আলবেনীয়।

আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া, কাজাকিস্থান, ককেসাস পর্বতমালা অতিক্রম করে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় সরে আসে। সেখানে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই শাখাটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ কয়েক শতাব্দী থাকে। ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই শাখা মেসোপটেমিয়ার একটি রূপ ধারণ করে এবং স্থানীয় আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সেমেটিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় আগমনকারীদের একটি অংশ মেসোপটেমিয়ার সেমেটিক ভাষাভাষী আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের মধ্যে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মিশে যায় কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয়দের কয়েকটি উপজাতি মেসোপটেমিয়া থেকে মূলভাষাসহ ইরান এবং ভারতীয় উপমহাদেশে আসে; এই জাতিটি আর্য নামে

পরিচিত। সেই সময় পশ্চিম ইরান থেকে উত্তর ভারতে সম্ভবত অনার্য দ্রাবিড় শ্রেণির মানুষেরা বসবাস করত। বহিরাগত আর্যরা ইরান, আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যে মিশে যায়নি তা থেকে মনে হয়, ইরান ও ভারতে আগমনকারী আর্যরা সংখ্যায় খুব কম ছিল না। তবে ইরান ও ভারতবর্ষে আগমনকারী আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর এই সমস্ত অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল। ইরান ও ভারতের আর্যপূর্ব প্রাচীন পারস্য ও দ্রাবিড় সভ্যতা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যদের ভাষা, ধর্ম ও রীতি-নীতির মধ্যে অবশ্য সাধারণ ইন্দো-ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে বজায় ছিল। ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইরানীয় ও আর্য উপভাষা প্রায় অভিন্ন ছিল, তারপর এই ভাষা ক্রমশ দুটি ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপে গড়ে ওঠে, যার একটি ইন্দো-ইউরোপীয় এবং অন্যটি ইন্দো-আর্য নামে পরিচিত হয়।

১.৪ অন্-আর্য ও আর্য ভাষা

ঋগ্‌বেদে ভারতের আদিম অধিবাসীদের ‘দাস’, ‘দস্যু’ বা ‘অসুর’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এরাই হল অন্-আর্য। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বদিকে আর্যদের অভিযানে এই অন্-আর্যরা ছিল প্রতিপক্ষ। সম্ভবত গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই অন্-আর্য দাসেরাই বাঙালির পূর্বপুরুষ। এই অন্-আর্যদের বৈশিষ্ট্য হল, তারা অবৈদিকভাষী, বৈদিক কর্মবিরোধী। বেদের দেবতাবিরোধী এবং স্বভাবতই আর্যধর্মে নিষ্ঠাহীন। এদের নাক চ্যাপ্টা এবং গায়ের রঙ কালো। সেই সময় আর্য সংস্কৃতির বাইরে প্রাচ্যের প্রত্যন্ত দেশ ছিল মগধ ও অঙ্গ। বৈদিক সংহিতায় মাগধদের বলা হয়েছে ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত, তারা যাযাবর এবং অসংস্কৃত প্রাকৃত ভাষী। ঐতরেয় আরণ্যক-এ বঙ্গ, বগধ বা মগধ এবং চেরদের বলা হয়েছে পাখি অর্থাৎ অন্-আর্য, যারা আর্যভাষী ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বৈদিক আর্য সভ্যতার প্রসার বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিকটে অবস্থিত মগধের কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধে তখন বেদাচারহীন ব্রাত্যদের আধিপত্য। এই ব্রাত্যদের মধ্যে থেকেই বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদের উদ্ভব হয়। সম্ভবত এই ব্রাত্যদের মুখেই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ‘প্রাকৃত’ রূপান্তর ঘটে বা আর্যভাষার মধ্যমস্তর শুরু হয়। এই প্রাকৃতভাষী মাগধী ব্রাত্যরাই বাংলাদেশে আর্য-সংস্কৃতির প্রচারক।

বাংলাদেশ মগধ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় মৌর্যদের শাসনকালে। তখন মগধ থেকে রাজপুরুষ, সৈন্যসামন্ত, ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে আসতে থাকে। তাদের সঙ্গে আর্য সংস্কৃতিরও প্রভাব বিস্তার ঘটে বাংলাদেশে। অশোকের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম প্রধান হওয়ায় বাংলাদেশেও সেই বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। আর এ সময় থেকেই বাংলাদেশে আর্যসভ্যতার প্রভাব বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্ত আমলেই প্রথম বৈদিক ধর্ম প্রচারিত হয়। চিনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলাদেশ আর্যভাষী হয়ে উঠেছিল। আর্যভাষা বাংলাদেশে, আসাম ও নেপালের সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর বিস্তৃত হতে পারেনি।

১.৫ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

আর্যভাষার প্রথম স্তর বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ব্যাপ্তিকাল খ্রিস্টপূর্ব ১২০০- খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ পর্যন্ত। এই সময় সাহিত্যের তিনটি স্তর ছিল—বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। এগুলিকে কেন্দ্র করে আর্যরা ছোটো ছোটো আর্যপল্লী বা আর্যসমাজ গড়ে তোলে। 'ঋকবেদ'-এর কিছু শ্লোককে একত্রে বেঁধে সুর যোজনা করে গায়কদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তাকে বলা হল 'সামবেদ'। 'যজুর্বেদ'ও সেই রকম। এছাড়া কিছু নতুন শ্লোক ও যজ্ঞের মন্ত্র একত্রিত করে তৈরি হয় 'অথর্ববেদ'। এছাড়াও রয়েছে 'সংহিতা', যেগুলি পদ্যে রচিত। এর পরের স্তর 'ব্রাহ্মণ'। ব্রাহ্মণগুলি এক হিসেবে বেদেরই ব্যাখ্যা। 'উপনিষদ' হল বেশিরভাগ গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট। ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা এর মূল কথা। এছাড়াও বেদ থেকে আরও নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন বারোটি অঙ্গে বিভক্ত 'সূত্র সাহিত্য'-যার ছয় বিদ্যা ও ছয় অঙ্গ।

পণ্ডিতদের মতে উপনিষদের ভাষা থেকেই সংস্কারজাত সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি। বৈদিক ভাষা বিকৃত হয়ে নতুন রূপ পায়, এই নতুন রূপই প্রাকৃতের জননী। এই সময়ে ভাষার তিনটি ধারা প্রচলিত হয়—ঋক্‌বেদের ভাষা, উপনিষদের ভাষা ও জনসাধারণের মুখে প্রচলিত মিশ্রিত-বিকৃত বৈদিক ভাষা। দ্বিতীয় ভাষাটির শিষ্ট রূপ পরে সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত হয়। আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে এই শিল্পরূপ গঠনে কৃতিত্ব দেখান পাণিনি। তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে বর্ণিত সরল বৈদিক আদর্শযুক্ত সংস্কৃত ভাষাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান বাহক। পাণিনি প্রাচ্য সংস্কৃত ভাষার বাক্‌ভঙ্গিও আলোচনা করেছেন 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে। বঙ্গদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হবার পর আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি এই সময়ে বঙ্গে প্রচলিত আর্যভাষার একমাত্র নিদর্শন। বাণভট্ট, ভামহ, দণ্ডী, খ্রিস্টীয় ৭ম-৮ম শতকে গৌড়ে গৌড়ী রীতির প্রচলন করেন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হল—

● **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) শব্দের প্রথমে ছাড়াও অন্যান্য স্থানে যুক্তব্যঞ্জনের বহুল ব্যবহার ছিল। যেমন ক্ক, ক্ত, ক্ষ, হ্ম, ন্দ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে ঐ সমস্ত যুক্ত ব্যঞ্জনগুলির সমীভবন ঘটেছে। কর্ম্ম > কম্ম > কাম, হস্ত > হত্থ > হাত।

(২) শব্দের মধ্যে সন্ধির ব্যবহার ছিল অপরিহার্য।

(৩) [এ] ব্যতীত [ঋ, ঐ, ঔ] সহ সমস্ত স্বরধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘ রূপের অস্তিত্ব ছিল। [এ] হ্রস্ব রূপেই উচ্চারিত হত। [ঌ] বৈদিকযুগের শেষের দিকেই লুপ্ত হয়ে যায়।

(৪) এই পর্বে তিনটি শিস ধ্বনিসহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অস্তিত্ব ছিল।

(৫) স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনে ক্রমানুসারে গুণ-বৃদ্ধি সম্প্রসারণ ঘটত। অর্থাৎ অপশ্রুতির চল ছিল। অ > আ > উ-এর আগমন হয়।

(৬) প্রতিটি বর্গে অনুনাসিক ধ্বনি ছিল এবং প্রতিটি ধ্বনিরই বিশিষ্ট উচ্চারণ পার্থক্য ছিল।

(৭) অঘোষ পৃষ্ঠব্যঞ্জন, বিসর্গ এবং কয়েকটি নাসিক্যধ্বনি পদান্তে উচ্চারিত হত।

(৮) তিন ধরনের সুরের অস্তিত্ব ছিল— উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত।

(৯) 'ক' বর্গের ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান নির্দিষ্ট ছিল; মূলত পশ্চাৎকণ্ঠ।

● **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :**

(১) শব্দরূপ ও ধাতুরূপে তিন ধরনের বচনের অস্তিত্ব ছিল—একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন। বচন অনুসারে শব্দরূপ ও ধাতুরূপের ব্যবহার পৃথক হয়ে যেত।

(২) তিন ধরনের লিঙ্গের অস্তিত্ব ছিল— পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। লিঙ্গ অর্থ নির্ভর নয়, ব্যাকরণগত। বিশেষ বিশেষ শব্দের লিঙ্গ ব্যাকরণ অনুসারে নির্দিষ্ট হত।

(৩) ছয় প্রকার কারকের ব্যবহার প্রচলন ছিল। প্রত্যেকটি কারকের আলাদা বিভক্তি ছিল।

(৪) ক্রিয়ার কাল ছিল পাঁচ প্রকার—লট্, লৃট, লঙ্, লুঙ্, লিট্।

(৫) 'প্র', 'পরা', 'অপ' ইত্যাদি উপসর্গগুলি শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদ গঠন ছাড়াও স্বাধীনভাবে প্রযুক্ত হত।

(৬) দুই রকমের প্রত্যয়ের প্রকার ছিল—কৃৎ ও তদ্ধিত। প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ গঠিত হত।

(৭) শর্তৃ ও শানচ্ প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠন হয়।

(৮) সংস্কৃতে সমাসের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয় যা বৈদিক স্তরের ভাষায় ছিল না।

১.৬ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার ব্যাপ্তিকাল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ খ্রিস্টাব্দ দশম শতক পর্যন্ত। দীর্ঘকালের এই ভাষাপ্রবাহকে ভাষা বিবর্তনের বিচারে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরে (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-২০০) বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার জন্ম হয়। অশোকের শিলালিপিতে উদীচ্যা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রাচ্যা—এই চার প্রকার ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় এই স্থানিক ভাষাগুলি ছিল তৎকালীন জনসাধারণের প্রচলিত কথ্যভাষা। এছাড়াও এই সময়-সীমার মধ্যে হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের রচিত গ্রন্থে ব্যবহৃত হত 'পালিভাষা'। পালি শব্দটির অর্থ যা পালন করে বা রক্ষা করে। এইসময়ই মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ 'মিশ্র সংস্কৃত' ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিল। প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা চর্চায় পালি ভাষার স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে বাংলা, অসমিয়া ও মৈথিলী প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির সঙ্গে পালির যোগ খুব ঘনিষ্ঠ।

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যস্তরে (খ্রিস্টীয় ২০০-৬০০) যেসকল ভাষা প্রচলিত ছিল সেগুলিকে সাধারণভাবে 'সাহিত্যিক প্রাকৃত' বলা হত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলি হল—মাগধী, অর্ধ-মাগধী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী নাম থেকেই অনুমান করা যায় এই ভাষাগুলির সবগুলিই ছিল আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক রূপ। এদের মধ্যে মাগধী প্রাকৃতকে পূর্বী প্রাচ্যার বংশধর বলা হয়। সাহিত্যিক প্রাকৃতের

আদিস্তর স্থানীয় প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অন্যদিকে প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে পরবর্তীকালে নতুন নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—'গান্ধারী প্রাকৃত', 'গৌড়ী প্রাকৃত' ইত্যাদি। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে মহাকবি দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে এই গৌড়ী প্রাকৃতের উল্লেখ করেন।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষস্তর (খ্রিস্টীয় ৬০০-১০০০) কে সাধারণভাবে 'অপভ্রংশ' এবং 'অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপকে 'অপভ্রাংশ' বা 'অবহট্‌' বলা হয়। অপভ্রংশ শুধু ভারতীয় আর্যের শেষ স্তর নয়, পণ্ডিতেরা একে একেবারে আলাদা ভাষা বলে মনে করতেন। সাধারণভাবে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'লৌকিক' ভাষা বা অশিক্ষিত লোকের কথ্যভাষা। প্রাকৃত ভাষা ও ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তরের মধ্যবর্তীকালে এই অপভ্রংশের অবস্থান কল্পনা করা হয়। এই অপভ্রংশ একসময় সাহিত্যের ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত উত্তরভারত, গুজরাট থেকে আসাম পর্যন্ত লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন হিসেবে জনমনে একচেটিয়া ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। মোটামুটিভাবে অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে অপভ্রংশের খোলস ত্যাগ করে অধিকাংশ ভারতীয় আর্যভাষাগুলি জন্ম নেয়। আমাদের বাংলাভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম একটি ভাষা।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম 'প্রাকৃত' থেকে বলে এই স্তরের নাম প্রাকৃত। এছাড়া এই স্তরে পালি, অপভ্রংশ ইত্যাদি ভাষার স্তর পেরিয়ে এসেছে। এদের সবগুলির মধ্যে কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা ভাষাতাত্ত্বিকেরা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল—

● **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি অর্ধব্যঞ্জন এই স্তরে লোপ পায়। 'ঌ' লুপ্ত হয়, 'ঋ' পরিবর্তিত হলেও রয়ে যায় এই স্তরে।

(২) 'আ', 'আউ', 'অয়' এবং 'অব' দীর্ঘ 'এ' এবং 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়।

(৩) শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জনের একটি লোপ পায়। আর মধ্য যুক্তব্যঞ্জন সমীভবনের সরলতা প্রাপ্ত হয়। যেমন—আত্মা > অপ্পা।

(৪) শব্দের শেষে ব্যঞ্জন ও বিসর্গ লোপ পায়। যেমন—জনঃ > জনে, মুনিঃ > মুনি।

(৫) তিন ধরনের শিসধ্বনি 'শ', 'ষ', 'স' একটি শিস ধ্বনি 'শ' অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'স'-এ পরিণত হয়।

(৬) স্বরমধ্যস্থিত একক স্পৃষ্টব্যঞ্জনের অস্তিত্ব রক্ষিত হয়।

● **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) শব্দরূপে সরলতা দেখা দিল। বিভিন্ন ধরনের শব্দরূপের পরিবর্তে অ-কারান্ত শব্দরূপের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়।

(২) তিনটি বচনের মধ্যে দ্বিবচন লোপ পেয়ে যায়।

(৩) বিশেষ, সর্বনাম পদের প্রভেদ লুপ্ত হয়।

(৪) পদগঠন মূলত নামমূলক।

(৫) অনুসর্গের ব্যবহার রক্ষিত হয়।

(৬) 'লঙ্' এবং 'লুঙ' একত্রিত হয়ে যায়।

(৭) কর্ম ভাববাচ্য লুপ্ত হয়ে যায়।

(৮) ধাতুরূপে আত্মনেপদ লুপ্ত হয়েছে। সর্বত্র পরস্মৈপদের ব্যবহার বেশি।

১.৭ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ। বিভিন্ন অপভ্রংশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম স্থানগত বিশেষত্ব নিয়ে ধীরে ধীরে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার রূপ ধারণ করেছে। এই স্তরে এসে ভারতীয় আর্যভাষা আরও সরল হল—ধ্বনির ক্ষেত্রে এবং রূপের ক্ষেত্রে। এই পর্বে বাক্যে পদ সংস্থান আরও সুনির্দিষ্ট হল। খ্রিস্টীয় ১০০০ শতকে নব্যভারতীয় আর্যভাষার সূচনা বলে অনেকে মনে করেন। যদিও কেউ কেউ এই কালসীমাকে অষ্টম বা নবম শতক পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান। দশম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে অপভ্রংশ, অবহট্টের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলো জন্ম নিয়েছে। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে সিন্ধি, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি, গুজরাটি, হিন্দি, অবধি, বাঘেলি, ছত্তিশগড়ি, মৈথিলি, মাগধী, ভোজপুরি, ওড়িয়া, বাংলা, অসমিয়া, মারাঠি, কোঙ্কনী অন্যতম। এদের মধ্যে দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার খোলস ছেড়ে যে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা বিভিন্ন স্থানে জন্ম নিয়ে আজও প্রবাহমান সেগুলিই আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা। যেমন— বাংলা অসমিয়া, ওড়িয়া ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট আছে সেগুলি বাদ দিয়ে সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আলোচনা করা হল—

● **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) যুগ্মব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয় এবং পরিণতি স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘায়িত হয়। যেমন— হস্ত > হত্‌থ।

(২) যুক্তব্যঞ্জনের ঠিক পূর্বে নাসিক্যধ্বনি ক্ষীণ হয়ে নাসিক্যধ্বনি লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী ধ্বনিটি সানুনাসিক ও দীর্ঘায়িত হয়।

(৩) ক্ষেত্র বিশেষে পদ মধ্যস্থিত 'ইঅ', 'উঅ' যথাক্রমে 'ই' এবং 'উ'-তে পরিণত হয়। যেমন— ঘৃত > ঘিঅ > ঘি।

(৪) বহু বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে।

● **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) প্রাচীন লিঙ্গ পার্থক্য লুপ্ত হয় এবং কখনো কখনো বিচিত্রতা প্রাপ্ত হয়।

(২) বচনের ক্ষেত্রে বহুবচনের প্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। শব্দের দ্বিত্ব করেও বহুবচন ব্যবহার করা হয়।

(৩) কারকে দুই ধরনের প্রাতিপাদিকের অস্তিত্ব দেখা যায়—মুখ্য ও গৌণ।

(৪) বিভক্তি অনুযায়ী কারক নির্দেশ লুপ্ত এবং বিভক্তির স্থলে অনুসর্গজাত পদ বা পদাংশ যুক্ত হয়ে থাকে।

(৫) ক্রিয়া পদের সরলীকরণ হয়েছে।

(৬) সকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালে কর্মবাচকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

(৭) যৌগিক ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

(৮) 'য়' শ্রুতি, 'ব' শ্রুতি বা শ্রুতিধ্বনির প্রচলন ঘটেছে।

(৯) ক্রিয়া বিশেষণ ও অন্য অর্থে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

১.৮ ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম শাখা ইন্দো-ইরানীয়ের একটি গোষ্ঠী এদেশে এসে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক ভাষার জন্ম দেয়। কালের স্রোতে, এদেশীয় ভাষার মিশ্রণে লৌকিক বা কথ্য সংস্কৃতের প্রসার ঘটে। তা থেকে ক্রমশ প্রাকৃত পালি ভাষা স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই ভাষাগুলি বেশ কিছুকাল পরে অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ ভাষাগুলোর জন্ম দেয়। এদের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ শাখার দুটি ভাষাস্তর পূর্বী ও পশ্চিমার মধ্যে পূর্বী শাখার দুটি উপস্তর দেখা যায়, বঙ্গ-অসমিয়া ও ওড়িয়া। ক্রমে বঙ্গ ও অসমিয়া আলাদা হয়ে গেলে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। এককথায় ইন্দো ইউরোপীয় থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার ভারতীয় আর্যের পালিপ্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠের স্তর পেরিয়ে মাগধীর খোলস ছেড়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলাভাষার বিবর্তনের কালক্রমটি নিম্নরূপ—

(১) ইন্দো-ইউরোপীয়, আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব।

(২) ইন্দো-ইরানীয়, আনুমানিক ২০০০-১৮০০ খ্রিস্টপূর্ব।

(৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্য, আনুমানিক ১৫০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্ব।

(৪) মধ্যভারতীয় আর্য, আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ।

ক. আদি-মধ্য ভারতীয় আর্য (৬০০-২০০ খ্রিস্টপূর্ব (অশোক-প্রাকৃত ও পালি)

খ. মধ্য-মধ্য ভারতীয় আর্য ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ (আদি শিলালিপি সমূহের প্রাকৃত, নাটকীয় প্রাকৃত, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রি, মাগধী, জৈন, অর্ধমাগধী)।

গ. অন্ত-মধ্য ভারতীয় আর্য ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ (অপভ্রংশ পশ্চিমা এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ)।

(৫) নব্য ভারতীয় আর্য ১০০০ খ্রিস্টাব্দ (কাশ্মীরি, পাঞ্জাবি, সিংহলি, গুজরাটি, হিন্দি, ভোজপুরি, মৈথিলি, ওড়িয়া, বাংলা, অসমিয়া, মারাঠি)।

বাংলা ভাষার উৎসগত রেখাচিত্র—

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী (খ্রিস্ট পূর্বঃ ২৫০০)

↓

ইন্দো-ইরানীয় আর্য (খ্রিস্ট পূর্বঃ ২০০০)

↓

ভারতীয় আর্য | ইরানীয় আর্য

↓ (ভারতীয় আর্য)

প্রাচীন ভারতীয় আর্য (খ্রিঃ পূর্বঃ ১৫০০-৬০০)

↓

ক্লাসিক সংস্কৃত | কথ্য সংস্কৃত

↓ (কথ্য সংস্কৃত)

মধ্যভারতীয় আর্য (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০- খ্রিস্টাব্দ ১০০০)

↓

প্রাকৃত (পালি) স্তর (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-২০০ খ্রিস্টাব্দ)

↓

মহারাষ্ট্রী (প্রাকৃত)	শৌরসেনী (প্রাকৃত)	পৈশাচী (প্রাকৃত)	মাগধী (প্রাকৃত)	অর্ধ–মাগধী (প্রাকৃত)
↓	↓	↓	↓	↓
মহারাষ্ট্রী (অপভ্রংশ) (অবহট্‌ঠ)	শৌরসেনী (অপভ্রংশ) (অবহট্‌ঠ)	পৈশাচী (অপভ্রংশ) (অবহট্‌ঠ)	মাগধী (অপভ্রংশ) (অবহট্‌ঠ)	অর্ধ–মাগধী (অপভ্রংশ) (অবহট্‌ঠ)

↓ (মাগধী অপভ্রংশ)

পূর্বী-মাগধী অপভ্রংশ | পশ্চিমা-মাগধী অপভ্রংশ

↓ (পূর্বী-মাগধী অপভ্রংশ)

বঙ্গ-অসমিয়া | ওড়িয়া

বা

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা (১০০১-বর্তমান কাল)

↓

বাংলা | অসমিয়া

১.৯ সারসংক্ষেপ

এই এককে পৃথিবীর ভাষাবংশ, আর্য-অনার্য ভাষারস্বরূপ, ভারতীয় আর্যভাষার উৎপত্তি এবং প্রাচীন-মধ্য নব্য আর্যভাষার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন, মধ্য, নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী জানতে পারবে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে ইন্দো-ইরানীয় শাখা হয়ে ভারতীয় আর্যভাষা উদ্ভবের ক্রম, সেখান থেকে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নব্যভারতীয় আর্যভাষা স্তর থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে, সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করছি। এছাড়াও প্রাচীন-মধ্য-নব্য ভারতীয় আর্যভাষাস্তরের বিভিন্ন পর্বে উদ্ভূত বিভিন্ন ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে শিক্ষার্থী ধারণা লাভ করবেন।

১.১০ অনুশীলনী

১. রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারতীয় আর্য ভাষার স্বরূপ নির্ণয় কর।
২. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সাধারণ লক্ষণগুলির পরিচয় দাও।
৩. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শ্রেণিবিন্যাস করে এর সাধারণ বিশেষত্বগুলি দেখাও।
৪. মধ্যভারতীয় আর্যভাষা কি? এই ভাষা কিভাবে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে?
৫. নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির বর্গীকরণ কর।
৬. নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৭. যে কোনো পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয়, মধ্য ভারতীয় ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের ধারা উল্লেখ কর।
৮. নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্মগত ও ভৌগোলিক বর্গীকরণ কর।

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. অলিভা দাক্ষী, ২০১৪, প্রাচ্য আর্যভাষা, সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা।
২. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা, কলকাতা।
৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৭, আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে, দে'জ, কলকাতা।
৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৭১, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, দে'জ, কলকাতা।
৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৬. রামেশ্বর শ, ১৩৯৪, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
৭. রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), ২০১১, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৮. সুকুমার সেন, ১৩৩৯, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা।
৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, নতুন দিল্লি।

একক ২: বাংলা ভাষার বিবর্তন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ বঙ্গ ও বাংলা ভাষা

২.৪ বাংলা ভাষা উদ্ভবের সময়কাল

২.৫ বাংলা ভাষার স্তর বিভাজন

২.৬ প্রাচীন বাংলা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

২.৭ মধ্য বাংলা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

২.৮ নব্য বাংলা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

২.৯ সারসংক্ষেপ

২.১০ অনুশীলনী

২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠে বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময়কাল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।
- এই একক পাঠে বাংলা ভাষার অবস্থান ভারতীয় ভাষা ইতিহাসের নিরিখে কোথায় তা জানা যাবে।
- এই একক পাঠে বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তরগুলি সম্পর্কে জানা যাবে।
- এই একক পাঠে বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানা যাবে।

২.২ প্রস্তাবনা

সপ্তম শতাব্দী থেকে নবম-দশম শতাব্দীর কোনো এক সময় নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার উদ্ভব বলে মনে করেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও পূর্বী-মাগধী ভাষাগুলি যেমন—বাংলা অসমিয়া, ওড়িয়া এবং পশ্চিমা-মাগধী ভাষাগুলি যেমন মৈথিলি, মাগধী এবং ভোজপুরি ভাষাগুলি যে একই প্রত্নভাষার বিবর্তিত রূপ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই সমস্ত বিষয় এখানে দেখা যাবে। পূর্বী-মাগধী ভাষাগুলির মধ্যে সাধারণ লক্ষণ বর্তমান থাকলেও এই ভাষাগুলির আধুনিক স্তরে বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে দেখা যাবে। ভাষার প্রাচীন স্তরে এই সমস্ত পার্থক্য দেখা যাবে না। এছাড়াও প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলার সময়ের স্তরে স্তরে ভাষাতাত্ত্বিক নানা নিজস্বতা নিয়ে ক্রমশ সরলীকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসটিকে দেখানো হবে এই এককের বিষয়।

২.৩ বঙ্গ ও বাংলা ভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের প্রাচ্য উপভাষা থেকে মাগধী প্রাকৃত ও পরবর্তী স্তরে মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। ভূগোল, ইতিহাস পরম্পরা ও ভাষাগত সাক্ষ্য বলে অঙ্গ, মগধ, মিথিলা অঞ্চলে আর্যভাষা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে বাংলায় আসা শুরু হয়। তবে প্রকৃত আর্য প্রভাব দেখা দেয় বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর। আর্যভাষা প্রসারের পূর্বে বঙ্গভূমিতে কোল ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল। মনে রাখতে হবে বাংলা কখনো এক দেশ-এক জাতি গঠন করেনি। গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র দেশটিকে চার অংশে ভাগ করেছে। গঙ্গা, করতোয়ার মধ্যে ভূভাগ পুণ্ড্র, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যভাগ বঙ্গ, হুগলি নদীর পশ্চিমে-উত্তরাংশ রাঢ়, দক্ষিণাংশ সুহ্ম। জল-জঙ্গলে ব-দ্বীপের অধিকাংশ অ-বাসযোগ্য। চার অংশে চারজন গোষ্ঠীর—পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্মের অবস্থান ছিল। আর্যধারা প্রতিষ্ঠা পেলে পেশা অনুযায়ী তাদের জাত স্থির হয়। অঙ্গ ও মগধ জনগোষ্ঠী যুক্ত ছিল, তেমনি উড়িষ্যার ওড্র এবং কলিঙ্গও। মনে হয় সেকালে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র জাতিও ভাষার বিচারে অখণ্ড যোগে যুক্ত ছিল। বাংলায় কোলেরা পরে এসেছে।

বাংলার মানুষেরা খ্রিস্টজন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে আর্যভাষা জানতো না বলে মনে হয়। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাদের শিল্প-কারিগরী বিদ্যা, হস্ত্যেয়ুবেদ ইত্যাদির প্রশংসা করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বাণিজ্যসূত্রে বাংলা ও মগধের যোগ ঘটে। মৌর্য পূর্ব ও মৌর্য যুগের যেমন মুদ্রা মগধে পাওয়া গেছে ঠিক তেমনি পাওয়া গেছে দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে। সম্ভবত অশোকের সময় থেকে বাংলায় আর্যায়ন প্রাবল্য পায়। তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য প্রদেশের থেকে বঙ্গদেশে আর্য ভাষা দেরিতে পৌঁছায়। বঙ্গে আর্যধারা প্রবর্তন হতে দেরি হওয়ার কারণে ভাষা বিকাশেও বিলম্ব হয়েছে। এর কারণে বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের অরণ্য মালভূমি অঞ্চল ও দক্ষিণের নিম্ন অঞ্চলেও পুণ্ড্র, রাঢ় ইত্যাদি অধিবাসীদের মধ্যেও এই নতুন ভাষা প্রসার হতে বিলম্ব হয়।

বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় শিলালেখটি অতি হ্রস্ব, এটি খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক সময় পর্বে রচনা। কালিদাসের প্রাপ্ত রঘুবংশে বঙ্গ ও সুহ্মের উল্লেখ আছে, যাতে এই অঞ্চলে বিজয়ের কথা বর্ণিত আছে। ভাসের নাটকে বাংলার শাসক বংশের কথা উল্লেখ আছে। এগুলি থেকে খ্রিস্টীয় তিনের দশকে আর্যায়নের কথা জানা যায়। গুপ্ত আমলে বাংলায় এই আর্যীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলেখতে সমতট-কামরূপ ও পূর্ববঙ্গ (ডবাক) বাসীদের প্রশস্তি খোদিত আছে। বস্তুত তাঁর আমলে মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণদের এনে ভূমিদান করে সংস্কৃতচর্চা অব্যাহত রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে তাম্র শাসনের সাক্ষ্য আছে।

অপরদিকে আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বে ভারতীয় আর্যভাষা দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্যস্তরে এসে পৌঁছায়। মধ্যভারতীয় আর্যের শেষ উপস্তর অপভ্রংশ থেকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি বিশেষত বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। সূচনাপর্বে বাংলা এবং অসমিয়া ভাষা একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর

পরবর্তীকালে বাংলা এবং অসমিয়া পৃথক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ পূর্বী-মাগধী ভাষাগুলির মধ্যে ওড়িয়া প্রথম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা থেকে অসমিয়া ভাষা পৃথক রূপ লাভ করে।

২.৪ বাংলা ভাষা উদ্ভবের সময়কাল

দশম শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব-এরকম একটি সিদ্ধান্ত মোটামুটি সমস্ত বাংলা ভাষার ইতিহাসকারেরা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই অনুমান চর্যাপদগুলির রচনার সময়কাল ধরেই করা হয়ে থাকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময় বলে চিহ্নিত করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় হিসেবে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীকে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে দশম শতাব্দীর কথা যারা বলেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুকুমার সেন। তবে একথাও মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল যে সপ্তম শতাব্দীতে পৌঁছাতে পারে একথা তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন, যেমন— ১. চর্যাপদগুলির ভাষা যদি সাহিত্যের ভাষা হয়, তাহলে তার আগে একটি কথ্যভাষার রূপ থাকা স্বাভাবিক। চর্যাপদের নিম্নতম সীমা যদি দশম শতাব্দী হয় এবং সে ভাষা যদি সাহিত্যের ভাষা হয়, তাহলে তার আগে বেশ কিছুদিন, সম্ভবত কয়েকশো বছর ভাষাটি কথ্য স্তরে বর্তমান ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলা পর্বের আগে একটি উদ্ভূয়মান স্তর স্বীকার করেছেন, যার পরিসর আনুমানিক ৭০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ। ৭০০ খ্রিস্টাব্দের আগে তিনি একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, যা থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি হয়তো এই নিম্নতম সীমা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, অর্থাৎ ৭০০ খ্রিস্টাব্দের আগেও বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব ছিল না বলে তিনি মনে করতেন। ৩. বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের মতের স্বপক্ষে একথা বলা যেতে পারে প্রাচীন বাংলা পর্বের আগেও অন্তত ২০০ বছরের একটি কথ্য স্তর ছিল। সেই স্তরের সূচনায় বাংলা ভাষার উদ্ভবের সূচনা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

২.৫ বাংলা ভাষার স্তর বিভাজন

বাংলা ভাষার সুদীর্ঘকালের ইতিহাস তিনটি পর্বে বিভক্ত—প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা এবং আধুনিক বাংলা। এর মধ্যে মধ্য বাংলা আবার দুটি উপস্তরে বিভক্ত—আদি মধ্য এবং অন্ত্য মধ্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়কালকে মাঝে রেখে মধ্যপর্বটিকে দুটি উপস্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রাচীন পর্বের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পর্বের সূচনা আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ ও শেষ ১২০০ খ্রিস্টাব্দ বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে এও বলেছেন ৯০০ খ্রিস্টাব্দের

আগেও এই পর্ব যেতে পারে। মধ্য বাংলার পরিসর ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। এই পর্বের আদি উপস্তর ১৩৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অন্ত্য উপস্তর ১৫০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্যপর্বের প্রায় পাঁচশ বছরের ভাষার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এই উপস্তরগুলির বিভাজনের মধ্যে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই আধুনিক বাংলা ভাষার সূচনা।

২.৬ প্রাচীন বাংলা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' নামে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় সেটিই প্রাচীন বাংলার নিদর্শন সূত্র। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার এই গ্রন্থটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। চর্যার স্বর-ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগত বিশেষত্ব আধুনিক বাংলার মতোই যদিও অনেক বানানে গরমিল বা যুগ প্রভাবে তৎসম-তদ্ভব শব্দের বানানে অসঙ্গতি, হ্রস্ব–দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ পার্থক্য সে যুগের মতো এ যুগেও দুর্লভ নয়। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে চর্যার ভাষা যে অবশ্যই বাংলা সে প্রমাণ মেলে। এছাড়াও দ্বাদশ শতকে পাওয়া সর্বানন্দের 'অমরকোষ' ব্যাখ্যা 'টীকাসর্বস্ব'-তে চারশোর বেশি বাংলা, আধা সংস্কৃত, তদ্ভব ও দেশি শব্দ পাওয়া গেছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের ভূমিদান পত্রে বা রাজকীয় শিলাপট্টে অনেক স্থান নাম পাওয়া গেছে। প্রধানত এগুলোই প্রাচীন বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক উপাদান।

প্রাচীন বাংলার কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। সেগুলি হল—

- **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) বর্ণ ও বানানের ক্ষেত্রে চর্যাপদের ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগত বিশেষত্ব আধুনিক বাংলার মতোই। তবে যে সব সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলিতে বানান ভেদ আছে, যেমন— সবর > শবর, পানি < পানী ইত্যাদি। বলা বাহুল্য 'ই', 'ঈ'কার প্রাচীন বাংলায় কোনোকালেই মেনে চলা হয়নি।

(২) উষ্ম ধ্বনির ক্ষেত্রে (শ, স, ষ) পার্থক্য নেই বানানে। যেমন— শবর > সবর, মন > মণ ইত্যাদি পাশাপাশি বসেছে নির্বিবাদে।

(৩) যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সরল ও পূর্বের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন— কর্ম্ম > কর্ম > কাম, জন্ম > জনম। আবার নাসিক্য ধ্বনির (ঙ, ঞ, ণ, ম, ন) একটি থাকলে ব্যঞ্জন সরল হলেও নাসিক্য ধ্বনি বজায় আছে। বন্ধ > বাঁধ।

(৪) স্বর মধ্যস্থ মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রাকৃতের 'হ' প্রাচীন বাংলায় লুপ্ত হয়। যেমন— সখি > সহি > সই, মধু > মহু > মউ ইত্যাদি।

(৫) শব্দের শেষে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে একটি লোপ পায়। যেমন— ঘৃত > ঘিঅ > ঘি, উত্থিত > উঠিঅ > উঠি ইত্যাদি।

(৬) শব্দের প্রথমে শ্বাসাঘাতের ফলে আদ্য অ-ধ্বনি দীর্ঘায়িত হয়। যেমন— কক্ষিকা > কচ্ছিআ > কাচ্ছি, চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ ইত্যাদি।

(৭) প্রাচীন বাংলায় পদান্তে স্বরধ্বনি রক্ষিত থেকেছে। যেমন— ভণতি > ভণই, গণতি > গণই, খাদিত > খাইঅ ইত্যাদি।

(৮) 'য়'-শ্রুতি, ব-শ্রুতি প্রাচীন বাংলায় রক্ষিত থেকেছে। যেমন— অমৃত > অমিঅ > অমিয়, সাগর > সাঅর > সায়র, চেতয়তি > চেঅসই > চেবই, ছেদয়তি > ছেঅঅই > ছেবই ইত্যাদি।

● **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) বচন দুই প্রকার ছিল প্রাচীন বাংলায়। একবচনের আলাদা করে কোনো বিভক্তি ছিল না। বহুবচন বোঝাতে বহুত্ববোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন সঅনা, সমাহিঅ, কিংবা দুবার বিশেষণ ব্যবহার করে; যেমন— 'উঁচা উঁচা পাবত'—বোঝানো হত বহুবচন।

(২) কারকের ক্ষেত্রে বিভক্তি প্রায়শই লুপ্ত থাকে প্রাচীন বাংলায়। ক্ষেত্র বিশেষে নতুন নতুন বিভক্তি যুক্ত হতেও দেখা যায়। আবার একই কারকে একাধিক বিভক্তি যুক্ত হতেও দেখা যায়। যেমন—এ/এঁ : কর্তায়— কুম্ভীরে খাঅ, করণে— কুঠারেঁ ছিজঅ, অপাদানে— জামে কাম কি কামে জাম ইত্যাদি।

(৩) অতীত কালের বিভক্তি—'ইল' এবং ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি—'ইব'।

যেমন— নিল, করিব, হোইব ইত্যাদি।

(৪) প্রাচীন বাংলায় সম্বন্ধ পদের বিভক্তি—'র', '-এর', '-অর' ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—রুখের, রাঅর, ডোম্বী-এর ইত্যাদি।

(৫) '-ই', '-ইআ', '-অন্তে' যোগ করে প্রাচীন বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হত। যেমন—করি, করিআ, পইসন্তে, চড়িলে ইত্যাদি।

(৬) আশ্চর্যের বিষয় চর্যায় দু'একটি বিদেশি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়— যেমন—মেহেরী যার অর্থ মহিলা মহল বা অন্তঃপুর। এটি এসেছে আবেস্তা শব্দ থেকে। মহেথন > ফরাসি শব্দ মেহেন > প্রাচীন বাংলা মেহেরী। আবার তুর্কি শব্দ 'ঠক্কুর' থেকে 'ঠাকুর' শব্দটি এসেছে প্রাচীন বাংলায়।

২.৭ মধ্য বাংলা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে ১২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্যযুগের এই বিশাল কালগত বিস্তৃতির জন্য এই সময়পর্বের বাংলা ভাষাকে দুটি উপস্তরে ভাগ করে

নেওয়া হয়। (ক) আদি-মধ্য বাংলা (১২০১-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) এবং (খ) অন্ত্য-মধ্য বাংলা (১৫০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) আদি-মধ্য উপস্তরের প্রথম দেড়শ বছরে রচিত কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। কেউ কেউ এই কালসীমাকে 'অন্ধকার যুগ' বলেছেন। এছাড়া প্রথম উপস্তরের নিদর্শন বসন্তরঞ্জন আবিষ্কৃত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং কিছু মঙ্গলকাব্য। দ্বিতীয় উপস্তর বা অন্ত্য-মধ্য বাংলার নিদর্শন হল বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদাবলি, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য ও লোককাব্য। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই দুটি উপস্তরের বিশেষত্ব ও পার্থক্য স্পষ্ট। এযুগে গদ্যরূপেরও উদ্ভব ঘটেছিল; চিঠিপত্র ও ভূমিদান পত্রে যার নমুনা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এই স্তরের বাংলা ভাষায় বহু আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দ ঢুকে গেছে। মধ্য বাংলার দুটি উপস্তরের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এখানে আলাদা করে আলোচনা করা হবে না। উপস্তরের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো এক সঙ্গে আলোচনা করে এই স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যটি ধরা হবে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(১) মধ্য বাংলায় 'নহ', 'হ্ম' প্রভৃতি সরল হয়ে 'ন' এবং 'ম'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন— কান্হ > কান, আহ্মি > আমি ইত্যাদি।

(২) শব্দের প্রথমে শ্বাসাঘাতের প্রবণতা লক্ষ করা যায় এই পর্যায়ের বাংলাতে। যেমন— আকারণ, আন্তর, আন্ধারি ইত্যাদি।

(৩) বানানের ক্ষেত্রে 'ন' ও 'ণ', 'ই, ঈ', 'উ, ঊ' পার্থক্য ছিল না। যেমন— নাল/ণাল, দ্যুতি/দূতী, উজল/ঊজল ইত্যাদি।

(৪) স্বরসঙ্গতির ব্যবহার খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়। যেমন— এখনী > এখুনী, তোলী > তুলী ইত্যাদি।

(৫) পদান্তে—অ ধ্বনি লোপের প্রবণতা দেখা যায়। অ-অন্তক ভাল, কান, সন্তাপ শব্দের সঙ্গে গোয়াল, দান, চাপ শব্দের অনুপ্রাস থেকে এই অনুমান করা যেতে পারে।

(৬) 'ঋ' ধ্বনি 'রি' রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায় মধ্য বাংলায় যেমন —কৃপাণ > কিরিপান।

(৭) সমীভূত ব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত হয় মধ্য বাংলায়। যেমন— অক্ষর > আখর, দুর্লভ > দুলভ ইত্যাদি।

(৮) পদের মাঝে 'ই' 'উ' নিজের জায়গা থেকে আগের অক্ষরে চলে আসে। যেমন— কালি > কাইল, আজি > আইজ, ধাতু > ধাউত ইত্যাদি।

(৯) মহাপ্রাণ নাসিক্য ও তাড়িত ধ্বনির মহাপ্রাণতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। যেমন— আহ্মার > আমার, বুঢ় > বুড় ইত্যাদি।

(১০) এই সময় নতুন স্বরধ্বনি 'অ্যা'-এর উদ্ভব হয়। যেমন— দ্যায়, বান্যা, থ্যান ইত্যাদি।

(১১) শব্দ মধ্যস্থ স্বরধ্বনি অনেকসময় লুপ্ত হয়। যেমন— গামোছা > গামছা, হরিদ্রা > হলদি।

(১২) মধ্য বাংলায় দ্ব্যক্ষর প্রবণতা বা দ্বিমাত্রিকতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। যেমন— ভগিনী > ভগ্নী, যাইতেছি > যাচ্ছি ইত্যাদি।

(১৩) ঢ, ক, হ্ম যথাক্রমে ড়, ন, ম তে পরিণত হয়। যেমন— বুঢ > বুড়, কাহ্নু > কানু, তোহ্মার > তোমার ইত্যাদি।

● **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) 'ইলা' যোগে অতীত, 'ইব' যোগে ভবিষ্যৎ কাল বোঝায় মধ্য বাংলায়। যেমন— কৈল, হৈলা, ইত্যাদি।

(২) উত্তম পুরুষে সর্বনাম 'আহ্ম' ও মধ্যম পুরুষে সর্বনাম 'তোহ্মে', বা 'তোঁ' ব্যবহৃত হতে দেখা যায় মধ্য বাংলায়।

(৩) স্ত্রীলিঙ্গের বিভক্তি 'ঈ'-এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— রাহী, বালী, বিকলী ইত্যাদি।

(৪) অসমাপিকা ক্রিয়াতে আছ্ ধাতু যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন— করি + আছ্ + এ = কর্য্যাছে। লই + আছ্ + এ = লইছে ইত্যাদি।

(৫) কারকবাচক অনুসর্গের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় মধ্যবাংলায়। যেমন— হতেঁ, হৈতেঁ, মাঝেঁ।

(৬) বক্তার আভিমুখ্য ও প্রাতিমুখ্য বোঝানোর জন্য 'গিয়া' ও 'সিয়া' অনুসর্গের ব্যবহারের প্রচলন ছিল মধ্য বাংলায়। যেমন— 'দেখ গিয়া', দেখ সিয়া ইত্যাদি।

(৭) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।

(৮) মধ্য বাংলায় বচন নিষ্পন্ন হয়েছে দুইভাবে। প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক। এই দুই ক্ষেত্রেই 'গণ' শব্দ যোগ হতে থাকে।

(৯) বিশেষ্যের বহুবচনে 'রা', 'দি' 'দিগ', 'গুলা', 'গুলি' ইত্যাদি বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

(১০) যৌক্তিক ক্রিয়ার ব্যবহার খুব লক্ষ করা যায় মধ্য বাংলায়। যেমন—পিয়ে, জিয়ে ইত্যাদি।

(১১) বিশেষ্যপদের সঙ্গে 'কর' ধাতু যোগ করে যুক্তিক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায় মধ্য বাংলায়।

২.৮ নব্য বাংলা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

উনিশ শতক থেকেই আধুনিক বা নব্য বাংলার যাত্রা শুরু। পনেরোশ থেকে আঠারোশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষার মান্য রূপটি গড়ে উঠেছিল। প্রথম মুদ্রিত ও প্রথম বাংলা গ্রন্থের প্রকাশ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে রামরাম বসু-র 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। এরপর থেকে ক্রমশ গদ্যের বিস্তার, নাটক, আখ্যান,

কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, সমালোচনা সাহিত্য, সাহিত্যতত্ত্ব, মাসিক পত্র প্রকাশ ইত্যাদি সাহিত্য কর্মে নব্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আরও উজ্জ্বল হতে থাকে। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের অনেক আগেই গদ্য রচনার সূত্রপাত হলেও ক্রমশ উনিশ শতকে গদ্যে সাহিত্য রচনা, শব্দ প্রয়োগ, বাক্য গঠনে নানা বিস্তার ঘটতে থাকে। গদ্য রচনার প্রবণতা বাড়ে, সাহিত্যে নতুন পথ ও নতুন ভাবনার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। এইভাবে বিচিত্র ভাবনা, বিষয় বৈচিত্র্য এবং প্রয়োগ স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক কালকে কারও কারও মতে রবীন্দ্রোত্তর যুগ বা সাম্প্রতিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবে এই স্তরের বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণও স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠেছে।

- **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :**

(১) নব্য বাংলায় স্বরসঙ্গতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— দেশি > দিশি, পটুয়া > পোটো ইত্যাদি।

(২) অভিশ্রুতির প্রয়োগ দেখা যায় নব্য বাংলায়। যেমন— দেখিয়া > দেইখ্যা > দেখে, পাইয়া > পাইয়্যা > পেয়ে ইত্যাদি।

(৩) বর্ণ সমতা এযুগের একটি তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ। যেমন— পদ্ম > পদ্দ, গল্প > গপ্প ইত্যাদি।

(৪) বিশেষ্য পদের সঙ্গে 'কর' ধাতু যোগ করে যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় এই পর্যায়ের বাংলা ভাষায়। যেমন— শ্রবণ করা, হত্যা করা, দান করা ইত্যাদি।

(৫) 'না' শব্দটি ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে বাক্য গঠন হয়ে থাকে এই পর্যায়ে। যেমন— না বললে যাবো না, না জানি কী হয় ইত্যাদি।

(৬) নাম ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার সাধু-চলিত উভয় ক্ষেত্রেই নির্বিবাদে চলতে থাকতে নব্য বাংলায়।

(৭) অর্থগত যতি চিহ্নের বদলে শ্বাসাঘাত দিয়ে একই বাক্যের ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় নব্য বাংলায়। যেমন— 'তুমি কী খাবে' এই বাক্যে 'কী'তে শ্বাসাঘাত দিলে এক অর্থ আবার 'খাবে'তে শ্বাসাঘাত দিলে অন্য অর্থ পাওয়া যায়।

(৮) সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার দেখা যায় সাধু চলিত দুই প্রকার গদ্যের মধ্যে। যেমন— নর ও নারী, রাম এবং শ্যাম ইত্যাদি।

- **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :**

(১) ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি 'ইব' ব্যবহৃত হয়।

(২) অ-কারান্ত কোনো কোনো ণিজন্ত ধাতুর রূপ অ-ণিজন্ত হয়ে গেছে। যেমন— ফেলা > ফেল, পৌঁছা > পৌঁছ ইত্যাদি।

(৩) নব্য বাংলায় কোনো কোনো সময় ক্রিয়াহীন বাক্য দেখা যায়। যেমন— 'বড় মনোরম পরিবেশ' 'সে খুব ভালো তবে কৃপণ' ইত্যাদি।

(৪) নব্য বাংলায় স্বর সংক্ষিপ্তও হয়ে যায়। যেমন— অউ > ও, চ উদ > চোদ্দ, হয়েন > হন ইত্যাদি।

(৫) আধুনিক বাংলায় নাম ধাতুর সম্বন্ধ পদে শূন্য বিভক্তির ব্যবহার কম। বিভক্তিহীনতা এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। গৌণ কারকের বিভক্তি হিসেবে—'দে', 'দিগ', যুক্ত হয়।

বাংলা ভাষার বিবর্তনগত রেখাচিত্র—

বাংলা ভাষা (১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল)

↓

- প্রাচীন যুগ (১০০০-১২০০ খ্রিঃ পর্যন্ত) — চর্যাপদ, বিদগ্ধ মুখমণ্ডল, সেক শুভোদয়া, অমর-কোষের ব্যাখ্যা
- মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০ খ্রিঃ পর্যন্ত)
  - আদি-মধ্য (১২০১-১৫০০ খ্রিঃ) — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
  - অন্ত-মধ্য (১৫০১-১৮০০ খ্রিঃ) — বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি মঙ্গলকাব্য, জীবনী সাহিত্য অনুবাদ সাহিত্য
- আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান কাল) — গদ্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, সমালোচনা সাহিত্য, সাহিত্য তত্ত্ব ইত্যাদি

২.৯ সারসংক্ষেপ

এই এককে বাংলা ভাষা উদ্ভবের সময়কাল, বিভিন্ন পর্বের মধ্যে দিয়ে আজকের বাংলা ভাষা উদ্ভবের স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার উদ্ভবের ক্রম, প্রাচীন-মধ্য-নব্য বাংলা ভাষার সময়কাল, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী জানতে পারে। প্রাচীন বাংলা, মধ্যবাংলার ক্ষেত্রে সমসাময়িক সাহিত্যিক নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নভ্যভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রেও প্রাত্যহিক ব্যবহৃত-নানান শব্দ, বাক্যের সাহায্যে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই একক পাঠের মাধ্যমে বাংলা ভাষার। বিভিন্ন স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

২.১০ অনুশীলনী

(১) বাঙালি ও বাংলা ভাষার উৎসগত ইতিহাসের পরিচয় দাও।

(২) বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময়কাল নিয়ে বিতর্কের পরিচয় দাও।

(৩) বাংলা ভাষার যুগ বিভাগ কর। প্রতিটি যুগের উদাহরণ উল্লেখ করে যে কোনো একটি যুগের বাংলা ভাষার লক্ষণগুলো উল্লেখ কর।

(৪) প্রাচীন বাংলার নিদর্শন কী কী? এই যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

(৫) বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(৬) মধ্য বাংলা ভাষার সাধারণ লক্ষণগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(৭) আধুনিক এবং বর্তমান কালের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(১) অলিভা দাক্ষী, ২০১৪, প্রাচ্য আর্যভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

(২) উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ২০১৬, ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৩) কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা, কলকাতা।

(৪) পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৭, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৫) পরেশচন্দ্র মুজমদার, ১৯৭১, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৬) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(৭) রামেশ্বর শ, ১৩৯৪, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

(৮) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), ২০১১, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(৯) সুকুমার সেন, ১৩৩৯, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা।

(১০) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, নতুন দিল্লি।

একক ৩: বাংলা উপভাষা

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ উপভাষা উৎপত্তির কারণ ও উপভাষার বৈশিষ্ট্য

৩.৪ ভাষা ও উপভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক

৩.৫ বাংলা উপভাষা বিষয়ে কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিকের মত

৩.৬ রাঢ়ী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৭ ঝাড়খণ্ডী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৮ বরেন্দ্রী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৯ কামরূপী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.১০ বঙ্গালী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.১১ সারসংক্ষেপ

৩.১২ অনুশীলনী

৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠে উপভাষা কী তা সম্যকভাবে জানা যাবে।
- ভাষা ও উপভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক ও উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যায়ক্রমে জানা যাবে এই এককে।
- উপভাষা উৎপত্তির কারণ জানতে পারা যাবে এই একক পাঠ করলে।
- বাংলা উপভাষার বিভাজন নিয়ে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকের মতামত জানা যাবে এই এককে।
- প্রধান পাঁচটি বাংলা উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক পাঠ প্রদান করা হবে বর্তমান এককে।

৩.২ প্রস্তাবনা

মানুষের ভাব বিনিময়ের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ও যথার্থ মাধ্যম হল ভাষা। একই ভাষায় স্থান বা অঞ্চলভেদে সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভাব বিনিময় করে তখন সেই জনগোষ্ঠীকে ভাষা সম্প্রদায় বা 'Speech Community' বলা হয়। ভাষাভাষীর অবস্থান, বসতি বা পরিবেশ ভেদে ভাষার ব্যবহারিক

স্তর, মর্যাদা ও উপযোগীতা গড়ে তোলে, তাতেই নানাবিধ রূপ ও পরিবর্তন দেখা যায়। উপভাষা প্রকৃত অর্থে ভাষা অপেক্ষা ভিন্ন নয়।

কোনো ভাষার যে মান্য বা প্রমিত রূপ দেখা যায়, তার সঙ্গে ধ্বনিগত, রূপগত ও বাক্য প্রয়োগের দিক থেকে যথেষ্ট স্বাধীন কিন্তু পৃথক নয় এমন পার্থক্যযুক্ত কোনো স্থানিক রূপকেই উপভাষা বলা হয়। মনে রাখতে হবে রূপভেদের দিক থেকেই পৃথক হলেও ভাষাগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, দূরত্ব ও অন্যান্য কারণে শব্দ ও উচ্চারণে কিছু পার্থক্য থাকলেও উপভাষাগুলি যে এক ভাষারই ধ্বনি ও রূপের একটি স্বকীয় স্থানিক নির্বাচনেরই রূপ কিংবা একই সাংস্কৃতিক অভ্যাসের রূপধারা তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ‘পারস্পরিক বোধগম্যতা’-ই ভাষা ও উপভাষার মূল সংযোগক্ষেত্র। আর একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়, বাংলায় ‘ভাষা’ বিশেষ্য পদটির আগে অব্যয়সূচক শব্দাংশ ‘উপ’ উপসর্গটি যোগ করে তৈরি হয়েছে ‘উপভাষা’। আক্ষরিক অর্থে ‘উপ’ কথাটির দ্বারা বিভিন্ন শব্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ বোঝালেও এখানে ‘সাদৃশ্য’ অর্থে ‘উপ’ উপসর্গটি ব্যবহৃত। কেননা উপ-রূপমূলটির অর্থ ‘নৈকট্য’ বা ‘সাদৃশ্য’। অতএব যা ভাষার নিকটবর্তী, ভাষার মতো বা ভাষার সদৃশ তাই উপভাষা। অনেকে এই ‘উপ’ শব্দটিকে খারাপ বা হীন অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে ‘উপভাষা’ শব্দটির অর্থ খারাপ, হীন বা ছোট ভাষা বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে এই বিতর্কটি সরিয়ে রেখে একে ‘উপভাষা’ না বলে ‘সহভাষা’ বলা যেতে পারে।

৩.৩ উপভাষা উৎপত্তির কারণ ও উপভাষার বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন কারণে উপভাষার সৃষ্টি হলেও বিস্তৃততর অঞ্চলে ভাষার ব্যাপ্তি ও সামাজিক স্তর বিন্যাস উপভাষা সৃষ্টির মূল কারণ। কোনো উপভাষা মূল ভাষা সম্প্রদায় থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুনভাবে বিকশিত হয়ে ক্রমশ একটা নতুন ভাষায় পরিণত হয়, বিশেষ কতকগুলো কারণকে সম্বল করে। যথা— ১. লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ২. শিক্ষার সহজ ব্যবস্থা, ৩. শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব, ৪. রাষ্ট্রিক ক্ষমতা পেলে তা ক্রমশ ভাষা বা Language-এ পরিণত হয়। যেমন— জার্মান ভাষার এক সময়ের উপভাষা আজ স্বতন্ত্র ভাষা ইংরেজিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আরাকানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগাযোগের কারণে আরাকানী ভাষার বৈশিষ্ট্য চট্টগ্রামী বাংলা ভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে চট্টগ্রামী বাংলা এক মিশ্রভাষায় পরিণত হয়েছে। এই ধরনের মিশ্রণজাত উপভাষাকে সংস্তর (Adstratum) বলে। অনেক ক্ষেত্রে নিজ ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও কোনো একটি উপভাষা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে, অন্য উপভাষাগুলোকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দিয়ে স্বতন্ত্র ভাষার জায়গা দখল করতে পারে। আবার বহিরাগত ভাষা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উৎকর্ষের কারণে ভাষা অঞ্চলের কোনো অংশে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেখানেও তৈরি হতে পারে উপভাষাগত বৈচিত্র্য। এবারে উপভাষার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. পৃথিবীর প্রায় সব ভাষারই উপভাষা আছে।

২. উপভাষার মধ্যে মূল ভাষার প্রাণশক্তি লুকিয়ে থাকে।

৩. উপভাষা একটি ভাষার আঞ্চলিক রূপ।

৪. উপভাষা তৈরি হয় একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের দৈনন্দিন মুখের ভাষা থেকে।

৫. উপভাষা কখনও মূল ভাষা থেকে ছাড়িয়ে যায় না।

৬. উপভাষার নিজস্ব একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডল থাকতে পারে।

৭. উপভাষা একটি অঞ্চলের স্থানিক, ঐতিহাসিক তথ্যভাণ্ডার হয়ে উঠতে পারে।

৮. সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা অভিঘাতের ফলে উপভাষা নিজে উন্নততর একটি স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে উঠতে পারে।

৩.৪ ভাষা ও উপভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক

ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই গভীর। এই দুটির মধ্যে আপাত কোনো পার্থক্য নেই, যেটুকু পার্থক্য আছে তা নিতান্তই আপেক্ষিক ও মনোগত। একই ভাষার আঞ্চলিক পৃথক রূপ হল উপভাষা। কিন্তু একই ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হলেই সবাই একই ভাষা বলবে, এক সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মীয় আচরণ পালন করবে, তা নয়। একই ভাষা সম্প্রদায়ের সব মানুষের ব্যবহৃত সব ধ্বনিই সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় তাও ঠিক নয়, উচ্চারণেও পার্থক্য ঘটে। পাশাপাশি অঞ্চলে এই পার্থক্য কম। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাষাতে উচ্চারণ পার্থক্য বেশি। ধ্বনি পরিবর্তন ও পদ প্রয়োগে সেই পার্থক্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। যেমন— পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলের ব্যবহার।

এক—একটি অঞ্চলের মানুষ আঞ্চলিক বিশেষত্ব নিয়েই তার ভাষা রূপ বা ভাষা ছাঁদ গড়ে তোলে—একেই বলে উপভাষা বা 'Dialect'। কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা এবং ব্যবহারের এলাকা বাড়লেই, নানা রকমের কর্ম পরিধিও বাড়ে। তখন অনেকেই তার নিজস্ব জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক বন্ধনে নিজের বসবাসকারী অঞ্চলের বিশেষত্বের প্রভাব পড়ে। তবে মূল ভাষার কাঠামোটি বদলায় না, শুধু আঞ্চলিক বিশেষত্বই দানা বাঁধে—জন্ম নেয় উপভাষা।

ভাষা ও উপভাষার সম্পর্কের আর একটি ক্ষেত্র হল 'পরস্পর বোধগম্যতা'। উপভাষাগুলির মধ্যে যদি পরস্পর বোধগম্যতা থাকে তবেই তারা একই ভাষার অন্তর্গত। যখন দুটি উপভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনের কথা দুটি ভিন্ন উপভাষায় বলে চলে এবং দু'জনে দু'জনের কথা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে তখনই বলা হয় তাদের উপভাষার মধ্যে পরস্পর বোধগম্যতা আছে।

৩.৫ বাংলা উপভাষা বিষয়ে কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিকের মত

বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত উপভাষা সমূহের সংখ্যা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সর্বপ্রথম স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ার্সন তাঁর 'Linguistic Survey of India' পঞ্চম খণ্ডে বাংলার আঞ্চলিক

উপভাষা সমূহের যে বিভাজন করেছেন তার সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। পরে এগুলিকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে ৪টি উপবিভাগের মধ্যে এগুলিকে বিন্যস্ত করেন। তাঁর বিভাজনটি নিম্নরূপ—

ক. **Western**

১. The Central (হুগলির ভাষা)

২. The South Western (দক্ষিণ-পশ্চিম তথা ওড়িশা সীমান্ত)

৩. The Western (পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম-বাঁকুড়াসহ সাঁওতাল পরগনা)

৪. The Northern (পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজবংশি)

খ. **Eastern**

১. The Central (যশোর, খুলনা)

২. The Eastern Central (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, সিলেট)

৩. The South Eastern (চট্টগ্রাম, নোয়াখালি)

৪. The Chakma of CHT (বর্তমান রাঙামাটি)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক বিবেচনা থেকে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের অন্যবিধ বিবর্তন বা বিবর্ধনকে তাঁর উপভাষা বিভাজনের আলোচনায় যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান। আর তারই ভিত্তিতে তিনি বাংলা উপভাষার চারটি রূপের কথা বলেন। যথা— ১. রাঢ়, ২. বরেন্দ্র, ৩. কামরূপ, ৪. বঙ্গীয়। পরবর্তী আলোচকগণ এই বিভাজনের সঙ্গে নিজস্ব কিছু অভিমতের যোগ-বিয়োগ ঘটিয়েছেন মাত্র। মুনীর চৌধুরী উপরের ভাগটিই রেখেছেন, শুধুমাত্র 'বঙ্গীয়' উপভাষাকে চারটি পর্যায়ে ও নানা উপপর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ্রিয়ার্সনের রীতি রক্ষা করে প্রত্যেক ভাগকে দুটি করে উপভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন— ১. উদীচ্য ও দক্ষিণ পশ্চিম, ২. দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব প্রান্তিক। পরেশচন্দ্র মজুমদার 'গৌড়ী' পর্যায়ে রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর বাংলার ভাষাগুলিকে এবং 'বঙ্গীয়' উপভাষার ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিভাজনকেই কিছু যোগ-বিয়োগসহ অনুসরণ করেছেন। সুকুমার সেন বাংলা উপভাষার বিভাজন বিষয়ে প্রথমে সুনীতিকুমারকে অনুসরণ করলেও তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ঝাড়খণ্ডী উপভাষাকে স্বতন্ত্র উপভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সুনীতিকুমার মহাশয় তা মেনেও নেন। সুকুমার সেন লিখেছেন—"স্থূল বিবেচনায় বাঙ্গালার প্রধান উপভাষা (আসলে উপভাষাগুচ্ছ) এই পাঁচটি—রাঢ়ী (মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা), ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা), বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গের উপভাষা), বঙ্গালী (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষা) এবং কামরূপী (উত্তর-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা)।" সুকুমার সেন-এর এই বিভাজন মনে রেখে বাংলা উপভাষার প্রধান পাঁচটি বিভাগের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

রামেশ্বর শ তাঁর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থে উক্ত পাঁচটি উপভাষার অবস্থান ছক কেটে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেটি এখানে দেওয়া হল—

রাঢ়ী—	মধ্য রাঢ়ী পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম রাঢ়ী— বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া পূর্ব রাঢ়ী— কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ।
বঙ্গালী—	পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ— ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম।
বরেন্দ্রী—	উত্তরবঙ্গ— মালদহ, দক্ষিণ-দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা।
কামরূপী—	উত্তর-পূর্ববঙ্গ— জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা।
ঝাড়খণ্ডী—	দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ—মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর।

৩.৬ রাঢ়ী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

(১) শব্দ মধ্য ই, উ, ক্ষ এবং য-ফলা যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী ‘অ’-এর উচ্চারণ ‘ও’-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন— অতি > ওতি, মধু > মোধু, > সত্য > শোত্তো ইত্যাদি। আবার অনেক ক্ষেত্রে অ-কারের ও-কার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— পাগল > পাগোল, বড় > বড়ো, বন > বোন ইত্যাদি।

(২) রাঢ়ীর সর্বপ্রধান লক্ষণ অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি জনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন। যেমন— মরিয়া > মরে, বাঁকিয়া > বেঁকে, বলিয়া > বইল্যা, দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, উনান > উনুন ইত্যাদি।

(৩) শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জন যেখানে লোপ পায় সেখানে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যীভবন ঘটে। যেমন— বন্ধ > বাঁধ, চন্দ্র > চাঁদ। কোথাও কোথাও আবার স্বতোনাসিক্যীভবন দেখা যায়। যেমন— পুস্তক > পুথি > পুঁথি ইত্যাদি।

(৪) ‘হ’ ধ্বনির লোপ প্রবণতা রাঢ়ীতে রয়েছে। যেমন— কহি > কই, দধি > দই ইত্যাদি।

(৫) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— দুধ > দুদ্; মাছ > মাচ্, বাঘ > বাগ। আবার শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘোষ ধ্বনি কখনো কখনো সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— ছাত > ছাদ্, কাক > কাগ্ ইত্যাদি।

(৬) রাঢ়ী উপভাষায় ‘ল’ কোথাও কোথাও ‘ন’ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— লবণ > নুন, লুচি > নুচি, লোহা > নোয়া ইত্যাদি।

(৭) রাঢ়ীতে মধ্য স্বরলোপ প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— জানালা > জানলা, ভগিনী > ভগ্নী ইত্যাদি।

(৮) বর্ধমান, বীরভূমের কোনো কোনো স্থানে 'এ্যা' উচ্চারণ 'এ' হয়ে যায়। যেমন— খ্যালা > খেলা, ব্যাপার > বেপার ইত্যাদি।

- **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে '—দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন— কর্মকারকে—আমাদের বই দাও। করণকারকে তোমাদের দ্বারা এ কাজ হবে না ইত্যাদি।

(২) রাঢ়ীতে গৌণ কর্মের বিভক্তি হয়—'কে' এবং মুখ্য কর্মের কোনো বিভক্তি হয় না। যেমন— আমি রামকে টাকা ধার দিয়েছি।

(৩) অধিকরণ কারকে '—এ' এবং 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন— ঘরে স্থানাভাব। 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে'।

(৪) ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষে 'ব', 'বো' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— আমি কাজ করবো/করব।

(৫) যৌগিক ক্রিয়াপদে সম্বন্ধ কালের 'ইয়া' প্রত্যয়, অসম্পন্ন কালে 'ই' অন্তক অসমাপিকা প্রয়োগ করে বোঝানো হয়। যেমন— গড়িছে > গড়ছে, মরিছিল > মরছিল ইত্যাদি।

(৬) মূল ধাতুর সঙ্গে 'আছ' ধাতু যোগ করে সেই 'আছ' ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে কালের নানা রূপ গঠন করা হয়। যেমন— কর + ছি = করছি। কর + ছিল = করছিল ইত্যাদি।

৩.৭ ঝাড়খণ্ডী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

- **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) ঝাড়খণ্ডীতে 'অ' স্থলে আনুনাসিকের আগম দেখা যায়। যেমন— সাঁবুন>সাবান, টঁক্‌চে>একটু ইত্যাদি।

(২) 'ও'-কারের 'অ'-কার প্রবণতা এই উপভাষায় দেখা যায়। যেমন—লোক > লক, চোর > চর, বোকা > বকা ইত্যাদি।

(৩) অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ প্রবণতা এই উপভাষায় লক্ষ করা যায়। যেমন—দূর > দুর, পতাকা > ফতাকা ইত্যাদি।

(৪) স্বরসঙ্গতির প্রভাবজাত অপিনিহিতির প্রচলন এই উপভাষায় লক্ষ করা যায়। যেমন— নড়বড়ে > লড়বইড়্যা, ভসভসে > ভসভইস্যা ইত্যাদি।

(৫) এই উপভাষায় স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— কক্ষ > কাঁখ, দেখিয়ে > দেখাঁই।

(৬) র, ন এর স্থানে 'ল' কার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— নাতি > লাতি, নয় > লয় ইত্যাদি।

(৭) 'হ' যুক্ত ধ্বনি বা মহাপ্রাণ প্রবণতার বাহুল্য বেশি দেখা যায়। যেমন— আমাকে > হামাকে, যাও > যাউ ইত্যাদি।

(৮) স্বরভক্তির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— রক্ত > রকত, কর্ম > করম ইত্যাদি।

- **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) নামধাতুর বাহুল্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন— মাথা দুখাচ্ছে ইত্যাদি।

(২) অস্ত্যর্থক 'বট' ধাতুর ব্যবহার বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন— ঝুড়িতে কি বটে ইত্যাদি।

(৩) যুক্ত ক্রিয়াপদে 'আছ' ধাতুর স্থলে 'বট' ধাতুর ব্যবহার বেশি দেখা যায়। যেমন— করি বটে, মিছা কথা বটে ইত্যাদি।

(৪) প্রচলিত সর্বনাম পদ ছাড়াও অতিরিক্ত 'মুই', 'মোকে', 'হামরা' ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়।

(৫) নির্দেশক বহুবচনে গুলা, গুলি, ছাড়াও 'গিলা', 'লা' এর ব্যবহার দেখা যায়।

(৬) অতীত ও ভবিষ্যৎকালে স্বার্থে '—ক' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন— যাবেক নাই? হবেক নাই ইত্যাদি।

(৭) নঞর্থক উপসর্গ ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন—নাই যাবো, নাই পারবো ইত্যাদি।

(৮) যৌগিক ও ণিজন্ত পদ বা প্রয়োজক ক্রিয়ার ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন— উঠা করানো, আনা করালাম ইত্যাদি।

৩.৮ বরেন্দ্রী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

(১) সানুনাসিক ধ্বনির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন— কাঁটা, চাঁদ ইত্যাদি।

(২) শব্দের আদিতে ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বলবৎ আছে। শব্দের শেষে অল্পপ্রাণ ধ্বনি দেখা যায়। যেমন— বাঘ > বাগ ইত্যাদি।

(৩) অনেক সময় 'জ' ধ্বনি ইংরেজি 'Z' ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়।

(৪) এই উপভাষায় অপিনিহিতির ব্যবহার থাকলেও এ > এ্যা-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন— এ্যাক, দ্যাও ইত্যাদি।

(৫) শব্দের আগে 'র' স্থানে 'অ' এবং 'অ' স্থানে 'র' এর আগম বরেন্দ্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—রজগর>অজগর, রামবাবুর আম বাগান > আম বাবুর রাম বাগান।

(৬) 'স', 'শ', 'হ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— শাগ > হাগ, সে > হে, সকলে > হগুলে ইত্যাদি।

● **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) কর্তৃকারকের বহুবচনে 'গুলি', 'গুলা' ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—মানুষগুলি/গিলা, ছেইল্যাদের ইত্যাদি।

(২) অতীত কালে উত্তম পুরুষে 'লাম', ভবিষ্যৎ কালের উত্তমপুরুষে 'ম', 'মু' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন— গড়লাম, রাখস, মুই ইত্যাদি।

(৩) গৌণ কর্মে 'কে', 'ক' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন— হামাক দ্যাও।

(৪) অসমাপিকা 'ইয়া' প্রত্যয়ের স্থানেও রাঢ়ী সুলভ-'এ' ব্যবহৃত হয়। যেমন— শুনিয়া > শুনে ইত্যাদি।

৩.৯. কামরূপী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

● **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:**

(১) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, কিন্তু মধ্য ও অন্ত্যাবস্থানে পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন— সমঝ > সমজ।

(২) কামরূপী উপভাষাতে 'ড়' 'র' তে রূপান্তরিত হয় এবং 'ঢ়' 'রহ'তে রূপান্তরিত হয়।

(৩) শব্দের আদিতে অবস্থিত 'অ' কখনো কখনো 'আ'তে পরিণত হয় যেমন অতি > আতি > অসুখ > আসুখ ইত্যাদি।

(৪) 'ণ' এবং 'ল' এর বিপর্যাস দেখা যায়। যেমন জননী > জলনী, নাঙল > লাঙল ইত্যাদি।

(৫) স্বরসঙ্গতির ফলে পূর্ববর্তী ই/উ ধ্বনির প্রভাবে পদান্তে আ > অ্যা হয়ে যায়। যেমন—প্রতিমা > প্রতিম্যা > পতিম্যা, উমা > উম্যা ইত্যাদি।

● **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) উত্তম পুরুষের এক বচনের সর্বনাম হল— মুই হাম।

(২) সামান্য অতীতকালে উত্তমপুরুষে—'ন' এবং প্রথম পুরুষে—ইল বিভক্তি দেখা যায়।

(৩) অধিকরণ কারকের বিভক্তি হল—'ত' যেমন— পাছত ইত্যাদি।

(৪) 'ল' যুক্ত ভাববচন দেখা যায়। যেমন— আসিল্ কালে।

(৫) গৌণ কর্মের বিভক্তি হল—'ক'। যেমন— বাপক ইত্যাদি।

(৬) শব্দরূপ ও গৌণ কর্ম সম্প্রদানে, অধিকরণে যথাক্রমে 'কে', 'ত' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— ঘরকে গেলাম, কোটোত যামু (কোর্টে যাব) ইত্যাদি।

৩.১০ বঙ্গালী উপভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

- **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) বঙ্গালীতে অপিনিহিতির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— কাটিয়া > কাইট্যা, দেখিয়া > দেইখ্যা ইত্যাদি।

(২) বিশেষ অঞ্চলে স, শ > হ হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন— সে > হে, সকল > হকল।

(৩) স্বর মধ্যগত 'হ' কার লুপ্ত হয় কিন্তু আদি 'হ' দুর্বল এবং লুপ্তপ্রায়। ফলে অবরুদ্ধ ধ্বনির উদ্ভব হয়। যেমন— হইব > ঐব, হয় > অয় ইত্যাদি।

(৪) নাসিক্যব্যঞ্জন বঙ্গালীতে লোপ পায় না। যেমন— চন্দ্র > চান্দ ইত্যাদি।

(৫) 'এ' প্রায়শই 'অ্যা' তে পরিণত হয়। তেল > ত্যাল, বেল > ব্যাল ইত্যাদি।

(৬) চ, ছ, জ, উচ্চারণ 'ৎস' এর মতো। যেমন— চলে > ৎসনে ইত্যাদি।

(৭) পদমধ্যস্থ 'হ' কার লোপ প্রবণতা দেখা যায়। আবার শ, স প্রভৃতি শিস্ ধ্বনি 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— আসে > আহে, সে > হে ইত্যাদি।

- **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য**

(১) ভবিষ্যৎ কালে উত্তমপুরুষের বিভক্তি 'ম' পাই। যেমন— পামু/পাইমু ইত্যাদি।

(২) শব্দরূপে কর্তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'এ' বিভক্তির যোগ দেখা যায়।

(৩) বহুবচনের প্রত্যয়গুলির বদলে 'গুলাইন', 'গুণ' ব্যবহৃত হয়।

(৪) করণ অনুসর্গ রূপে 'সাথে', 'লগে' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

(৫) কোথাও কোথাও তুচ্ছার্থক কর্তার পরে আদরার্থক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— তুই বসো, তুই কওনা শুনি ইত্যাদি।

(৬) অসমাপিকার সাহায্যে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার সম্পন্নকালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে, অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন— রাম গ্যাসে গিয়া ইত্যাদি।

৩.১১ অনুশীলনী

এই এককে ভাষা, উপভাষার স্বরূপ, পার্থক্য, উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ভাষা, উপভাষার পারস্পরিক সম্পর্কে প্রসঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে উপভাষা বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মতামত, বাংলা ভাষার অন্তর্গত উপভাষাগুলির প্রাপ্তিস্থল সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা জানি বাংলা ভাষায় প্রচলিত প্রধান পাঁচটি উপভাষা— রাঢ়ী, বাঙ্গালী, কামরূপ, বরেন্দ্রী ও ঝাড়খণ্ডী। বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে এই পাঁচটি উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা

হয়েছে এই এককে। এই একক পাঠ করলে শিক্ষার্থী বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে।

৩.১২ অনুশীলনী

(১) উপভাষা কাকে বলে? বাংলায় কটি উপভাষা আছে, কী কী?

(২) উপভাষার লক্ষণগুলি কি? তুমি যে উপভাষা মণ্ডলে বসবাস কর তার বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ লেখ।

(৩) বাংলা উপভাষা কটি ভাগে বিভক্ত, কি কি? যে কোনো দুটি উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা কর।

(৪) কি কি কারণে উপভাষার সৃষ্টি হয়? বাংলায় প্রধান উপভাষা কি কি? কোন কোন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়? যে কোনো একটি সার্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

(৫) উপভাষা কি? বাংলা উপভাষা বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কর।

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

(১) অলিভা দাক্ষী, ২০১৪, প্রাচ্য আর্যভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

(২) উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ২০১৬, ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৩) কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা, কলকাতা।

(৪) জীবেশ নায়ক, ২০১৪, ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা, একুশ শতক, কলকাতা।

(৫) পবিত্র সরকার, ২০০৬, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৬) পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৭, ১৯৭১, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৭) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

(৮) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(৯) মহাম্মদ দানীউল হক, ২০০২, ভাষাবিজ্ঞানের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(১০) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), ২০১১, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(১১) সুকুমার সেন, ১৩৩৯, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা।

(১২) রামেশ্বর শ, ১৩৯৪, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

(১৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, নতুন দিল্লি।

একক ৪ : শব্দভাণ্ডার

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ প্রস্তাবনা
৪.৩ মৌলিক শব্দ
৪.৪ আগন্তুক শব্দ
৪.৫ অনূদিত ঋণ শব্দ
৪.৬ সারসংক্ষেপ
৪.৭ অনুশীলনী
৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে বাংলা শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

- বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎস ও বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে এই একক পাঠে।
- বাংলা শব্দভাণ্ডারে কত রকমের শব্দ আছে তা জানা যাবে এই একক পাঠ করলে।
- শব্দভাণ্ডার যে কোনো ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; এই এককে বিস্তারিতভাবে শব্দভাণ্ডার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

৪.২ প্রস্তাবনা

যে কোনো ভাষার প্রধান সম্পদ নিহিত তার শব্দভাণ্ডারের মধ্যে। কাজেই যে ভাষার শব্দ সম্ভার যত বেশি, সেই ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যে কোনো ভাষায় শুধু শব্দজ্ঞানের সাহায্যেই কাজ চালানো গোছের মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব। আর শব্দরাশি যে শুধু ভাব প্রকাশেরই উপাদান তা নয় এর মধ্য দিয়ে এক একটা জাতির আচার আচরণ, গতিবিধি, সভ্যতা ও সংস্কার— এক কথায় তার প্রাণ রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রত্যেক ভাষার প্রধান অবলম্বন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভাষার উপর। তারপর একদিকে যেমন নবসৃষ্ট শব্দের সাহায্যে এবং অন্য ভাষা থেকে ঋণ নিয়ে একটি ভাষা তার শব্দসম্ভার বাড়িয়ে চলে, তেমনি কখনো কখনো অপ্রয়োজনে, কখনো বা কোনো অজ্ঞাত কারণে অনেক শব্দ ভাষা থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা তথা প্রাকৃত-অবহট্টের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা জন্মলাভ করেছে। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত-মাধ্যমে বিবর্তিত শব্দগুলোই বাংলা ভাষার নিজস্ব-শব্দ— এগুলোর পারিভাষিক নাম 'তদ্ভব শব্দ'। তদ্ভব শব্দের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ 'তৎসম' শব্দেরও। উৎসের বিচারে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়— মৌলিক ও আগন্তুক। বাংলা ভাষা জন্মের আগে থেকে সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ অবিকৃতভাবে এবং তা থেকে বিবর্তিত যে সব শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলোই মৌলিক শব্দ। আর সংস্কৃত বাদে যে সব শব্দ অন্য

ভাষা থেকে বিভিন্ন ভাবে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় আগন্তুক শব্দ। একটি রেখা চিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে।

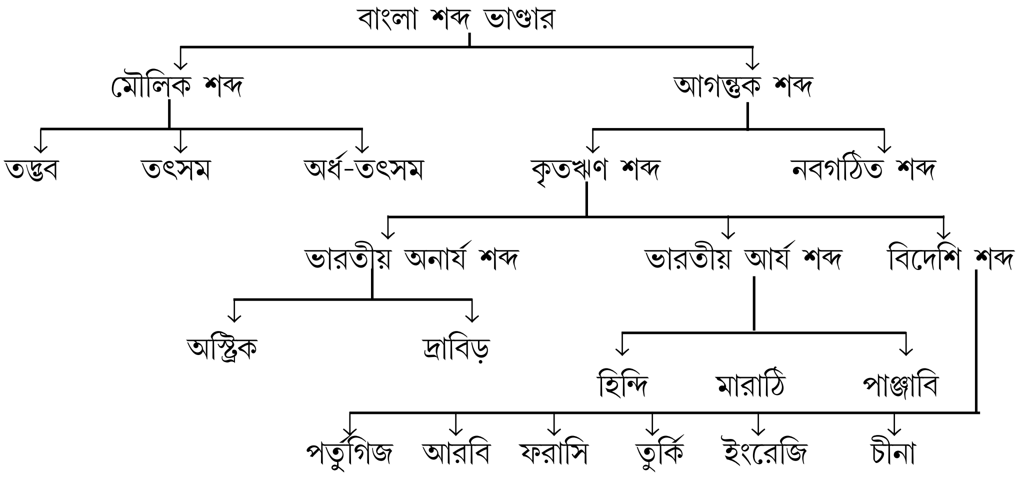

৪.৩ মৌলিক শব্দ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে ক্রমবিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে বলেই উক্ত ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো শব্দ 'মৌলিক শব্দ' বলে অভিহিত হয়ে থাকে। যে শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে, তাদের বলা হয় 'তদ্ভব শব্দ'। যে শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে সরাসরি অবিকৃত বানানে বাংলায় গৃহীত হয়েছে তাদের বলা হয় 'তৎসম শব্দ'। আর যে শব্দগুলো সংস্কৃত থেকেই সরাসরি বাংলায় এসেছে বিস্তৃতভাবে, তাদের বলা হয় 'অর্ধতৎসম শব্দ'। মৌলিক শব্দ বলতে এই তিনটি শব্দ শ্রেণিকেই বোঝায়।

(১) **তদ্ভব শব্দ :** প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ প্রাকৃতের মাধ্যমে ধারাবাহিক পরিবর্তন লাভ করে শব্দগুলো বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। শুধু সংস্কৃত শব্দই যে প্রাকৃত মাধ্যমে বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে তা নয় অন্যান্য অনেক অসম্পৃক্ত গোষ্ঠীর ভাষা অথবা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা থেকেও তা সংস্কৃত মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। যেমন—মৃত্তিকা > মাটিআ > মাটি, সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ, পিতৃস্বসৃকা > পিউসস্সিআ > পিসি ইত্যাদি।

(২) **তৎসম শব্দ :** তদ্ভব শব্দগুলো বাংলার মূল শব্দভাণ্ডার গড়ে তুললেও কালে কালে তৎসম শব্দের ব্যবহার প্রবণতা তদ্ভবকে ছাড়িয়ে গেছে। তৎসম শব্দের অনুপ্রবেশ বাংলা ভাষার আদি স্তরেই শুরু হয়েছিল। যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিত ভাবে বাংলায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে বলা চলে 'প্রাকৃত তৎসম'। যেমন—পিতা, অন্ন, ভূমি ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় এমন অনেক তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয় যেগুলো বানানে সংস্কৃত হলেও উচ্চারণের দিক থেকে প্রাকৃত বা বিকৃত, এগুলোকে কেউ কেউ 'বিকৃত তৎসম' আখ্যা দিয়েছেন। যেমন—কৃষ্ণ (ক্রিশন), সহ্য (শোজ্ঝ) ইত্যাদি। আবার কথ্য

সংস্কৃতে প্রয়োগ ছিল অথচ ব্যাকরণ অভিধানে সমর্থন নেই, এমন কিছু কিছু শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, এদের বলা হয় 'অসিদ্ধ তৎসম'। যেমন— অন্ধল কৃষাণ, নবল ইত্যাদি।

(৩) অর্ধ-তৎসম : যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে, অথচ শব্দগুলো কালোচিত বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, তেমন শব্দগুলোকে 'অর্ধ-তৎসম শব্দ' বলে। যেমন—কৃষ্ণ > কেষ্ট, গৃহিণী > গিন্নি, চন্দ্র > চন্দর ইত্যাদি। তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম—উভয়ই সংস্কৃত থেকে আগত এবং কালোচিত বিকৃতি প্রাপ্ত, পার্থক্য এই—তদ্ভব শব্দগুলো প্রাকৃত স্তরেই বিকৃত হয়েছিল, তারপর আরও বিকৃতি নিয়ে বাংলায় আসে। অর্ধতৎসম সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাংলায় প্রাপ্ত। একই শব্দের দ্বিবিধ রূপও বাংলায় যথেষ্ট প্রচলিত আছে। যেমন—কৃষ্ণ > কেষ্ট > কানু, গৃহিণী > গিন্নি > ঘরনি, চন্দ্র > চন্দর > চাঁদ, রাত্রি > রাত্তির > রাতি ইত্যাদি।

৪.৪ আগন্তুক শব্দ

বাংলা ভাষায় যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি গৃহীত হয়েছে তার বাইরে আর সমস্ত শব্দই 'আগন্তুক শব্দ'। বাংলা ভাষায় আর্য, অনার্য নানা ভাষার শব্দ গৃহীত হয়েছে। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের তিন জাতীয় শব্দ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত—দেশি, বিদেশি ও প্রাদেশিক শব্দ।

(১) দেশি শব্দ : ভারতের অধিবাসীদের একটা বৃহৎ অংশে অনার্য অধিবাসী। এদের মধ্যে প্রধান দুটি গোষ্ঠী হল দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠী। এদের ভাষা থেকে যে সকল শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে তাদের বলা হয় দেশি শব্দ। যেমন অষ্ট্রিক শব্দ হল—উচ্ছে, ঝিঙে, খোকা, মুড়ি, ঢেঁকি ইত্যাদি। দ্রাবিড় শব্দ—চুরুট, আকাল, কানাড়া, প্যান্ডেল ইত্যাদি।

(২) বিদেশি শব্দ : আগন্তুক শ্রেণির অপর একটি প্রধান শাখা হল বিদেশি শব্দের শাখা। প্রায় হাজার হাজার বছর আগে তুর্কী, মুঘলেরা ভারতে আসে, পরে আসে ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগিজরা। এদের ভাষার অনেক শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে। দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে এদের অনেকগুলোই বাংলা ভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, এদের আর বিদেশি বলে চেনার উপায় নেই। যেমন—

ফরাসি শব্দ— রোজ, হপ্তা, উকিল, আন্দাজ, সিন্দুক ইত্যাদি।

আরবি শব্দ— আইন, আক্কেল, কিতাব, কেচ্ছা, কলম ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ— চাকু, চিঠি, কুলী, কাঁচি ইত্যাদি।

চীনা শব্দ— চা, চিনি, লুচি, লিচু ইত্যাদি।

পর্তুগিজ শব্দ— আনারস, আলপিন, আতা, আলমারী ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ— পেন, পিন, ব্যাগ, ক্লাব, আর্ট ইত্যাদি।

(৩) প্রাদেশিক শব্দ ঃ বাংলা ভাষার মতোই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা, মাধ্যমে উদ্ভূত ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কিছু কিছু শব্দও বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলোও আগন্তুক শব্দের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দি থেকে 'পাণি', 'মিঠাই', 'লাগাতার' 'বন্ধ' ইত্যাদি শব্দ। গুজরাটি থেকে 'হরতাল', 'খাদি' ইত্যাদি। মারাঠি থেকে—বর্গী, পাটীল পাঞ্জাবি থেকে শিম, চাহিদা, ভাঙরা ইত্যাদি।

৪.৫ অনূদিত ঋণ

বেশ কিছু ইংরেজি শব্দকে বাংলায় অনুবাদ করে ব্যবহার করা হয়। শব্দগুলো বাংলা কিন্তু অনুবাদের ধরন ইংরেজির মতো। এদের বলা হয় 'অনূদিত ঋণ' শব্দ। এই শব্দগুলোর অনেকগুলোই আকারে তৎসম, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানে এদের স্থান নেই। কারণ এগুলো একালেই সৃষ্ট হয়েছে। যেমন— বিশ্ববিদ্যালয় (University) উড়াল পুল (Fly Over), হাতে গড়া (Home Made), মাতৃভাষা (Mother Language), হাত ঘড়ি (Wrist Watch), কাঁদানে গ্যাস (Tear Gas) ইত্যাদি।

৪.৬ সারসংক্ষেপ

বাংলা শব্দভাণ্ডার তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশি, বিদেশি, বিভিন্ন শব্দের সম্ভারে গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষা থেকে গৃহীত শব্দঋণের ওপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। আমরা এই এককে বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিভিন্ন পর্যায়ের (মৌলিক ও আগন্তুক শব্দ, তৎসম, তদ্ভব, হিন্দি মারাঠি, আরবি-ফারসি, ইংরেজ শব্দ) বৈশিষ্ট্য, উদাহরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই একক পাঠ করলে শিক্ষার্থী বাংলা শব্দভাণ্ডার গঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে।

৪.৭ অনুশীলনী

(১) বাংলা শব্দভাণ্ডারের গঠনে আগন্তুক শব্দগুলোর শ্রেণিবিন্যস্ত রূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
(২) বাংলা শব্দভাণ্ডারে কত রকমের শব্দ আছে উদাহরণযোগে সেগুলোর পরিচয় দাও। এ বিষয়ে তৎসম শব্দের গুরুত্ব নির্দেশ কর।
(৩) বাংলা শব্দভাণ্ডারের একটি সংক্ষিপ্ত ও শ্রেণিবিন্যস্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।
(৪) বাংলা শব্দভাণ্ডারের সংস্কৃত বা সংস্কৃত মূল নয় এমন যেসব জাতের শব্দ আছে, উদাহরণসহ তাদের পরিচয় দাও।
(৫) বাংলা শব্দকে মৌলিক, আগন্তুক দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার যৌক্তিকতা কী? প্রসঙ্গত আগন্তুক শব্দের শ্রেণিবিন্যাস কর।
(৬) বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের শ্রেণি পরিচয় ও সংজ্ঞা দাও।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(১) অলিভা দাক্ষী, ২০১৪, প্রাচ্য আর্যভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।
(২) উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ২০১৬, ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
(৩) কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা, কলকাতা।
(৪) জীবেশ নায়ক, ২০১৪, ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা, একুশ শতক, কলকাতা।
(৫) পবিত্র সরকার, ২০০৬, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৬) পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৭, ১৯৭১, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
(৭) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।
(৮) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
(৯) মহাম্মদ দানীউল হক, ২০০২, ভাষাবিজ্ঞানের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
(১০) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), ২০১১, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
(১১) সুকুমার সেন, ১৩৩৯, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা।
(১২) রামেশ্বর শ, ১৩৯৪, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
(১৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, নতুন দিল্লি।

মডিউল ঃ ২

একক ৫ বচন লিঙ্গ পুরুষ

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ বচন

৫.৪ বচনের প্রকারভেদ

৫.৫ লিঙ্গ

৫.৬ লিঙ্গের প্রকারভেদ ও লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি

৫.৭ পুরুষ

৫.৮ পুরুষের প্রকারভেদ

৫.৯ সারসংক্ষেপ

৫.১০ অনুশীলনী

৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠে বাংলা রূপতত্ত্বের নানা এলাকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব গঠনের নানা প্রস্থানগুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।
- শব্দ বাক্যে প্রযুক্ত হতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয় যুক্ত হয় সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।
- বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ কাকে বলে এবং শব্দের সঙ্গে এগুলি কীভাবে যুক্ত হয়ে বাক্য গঠনের দিকে এগিয়ে যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই এককে পাওয়া যাবে।

৫.২ প্রস্তাবনা

যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণকে ব্যাপক অর্থে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে— ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব। ভাষার সব থেকে ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি। ন্যূনতম শব্দজোড় মিলে যে অর্থপূর্ণ একক গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় শব্দ। এই শব্দের গঠন, শ্রেণিবিভাগ, রূপবৈচিত্র্য, নানা উপকরণ (বচন, লিঙ্গ, কারক বিভক্তি, পুরুষ, উপসর্গ, অনুসর্গ, প্রত্যয়) হল রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। শব্দ গঠন হওয়ার পর পরেই তা বাক্যে ব্যবহৃত হয় না; তার পূর্বে পদ গঠিত হয়। শব্দ যখন পদে রূপান্তরিত হয় তখন তার

সঙ্গে নানা বিষয় যুক্ত হয়। এই পুরো বিষয়টিকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা রূপতত্ত্বের এলাকা বলে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলা ব্যাকরণে পাঁচ প্রকার পদের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। যেমন— বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। বলা বাহুল্য শব্দ তৈরির নানা প্রক্রিয়া আছে। যেমন কিছু শব্দ আছে যেগুলি একটি মাত্র রূপ নিয়ে গঠিত হয়, সেগুলিকে বলে সিদ্ধ বা মৌলিক শব্দ। আবার কোনো কোনো শব্দ একাধিক রূপের সংযোগে গঠিত হয়। এদের বলে জটিল বা সমাসবদ্ধ শব্দ। এই জটিল বা সমাসবদ্ধ শব্দের গঠনের কারণেই বাংলা রূপতত্ত্বের কতকগুলো মূলসূত্র রয়েছে। যেমন— গঠনগত, রূপবৈচিত্র্য, ব্যাকরণিক, লিঙ্গ, বচন ইত্যাদি।

৫.৩ বচন

যার সাহায্যে নাম, বস্তুর সংখ্যা বিষয়ে আমাদের বোধ জন্ম নেয়, তাকে বচন বলে। বচন দ্যোতক প্রত্যয় বা শব্দের মাধ্যমে কোনো বস্তুর একত্ব বোঝা যায়, কিংবা বলা যায়, বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যা বোঝাতে বচন ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় বচনের প্রভাব ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়। সর্বনামে বচনের প্রভাব যথেষ্ট, তবে বিশেষণে নেই। ক্রিয়ার সঙ্গেও বচনের আলোচনার প্রয়োজন আছে। বাংলা ভাষায় বচনকে মূলত কারক-প্রণালীর অধীন করে দেখা হয়। কিন্তু হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলা বচন ব্যাকরণ-নির্ভর নয়। অর্থাৎ কর্তা-বিশেষ্য বা সর্বনামে বহুবচন হলে তার বিশেষণ বা বাক্যের ক্রিয়ারূপের কোনো পরিবর্তন হয় না।

৫.৪ বচনের প্রকারভেদ

বৈদিক ও সংস্কৃতে একবচন-দ্বিবচন-বহুবচন— তিনটি বচন ছিল। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে বচনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। মধ্য ভারতীয় আর্য বা পালি-প্রাকৃতে ভাষার দ্বিবচন লোপ পেয়েছে। স্বভাবতই বাংলা ভাষায় বচন দুটি— একবচন ও বহুবচন। যে বচন দ্বারা শুধুমাত্র একটি বস্তুকে বোঝায়, তাকে একবচন বলে। যেমন— গাছ, পাখি, মানুষ ইত্যাদি। যে বচনের মাধ্যমে একের অধিক পদার্থ বা বস্তু বোঝায় তাকে বহুবচন বলে। যেমন— গাছগুলো, পাখিসব, মানুষেরা ইত্যাদি।

শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনের কিছু বিভক্তি আছে। নির্দেশক যোগ করে একবচন ও বহুবচন গঠন করা হয়ে থাকে। যেমন— একবচনের ক্ষেত্রে পেনটা, বইটা, লোকটি ইত্যাদি। এছাড়া এক, একটি, একজন যোগ করেও একবচন গঠন করা হয়। যেমন—এক ছেলে, একটি গাছ, একজন লোক ইত্যাদি।

বহুবচনের ক্ষেত্রে নানা উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে বাংলা ভাষায়। সেগুলি হল—

(১) সমষ্টিবাচক— মানুষজন, নারীসমাজ, ছাত্রগণ ইত্যাদি।

(২) বিভক্তি যোগে—'রা', 'এরা', দিগের ইত্যাদি যোগ করে বহুবচন গঠন করা হয়। যেমন—আমরা, তোমরা ইত্যাদি।

(৩) সংখ্যা যোগে বহুবচন গঠন করা হয়। যেমন— বছর চারেক, দশটি ছাত্র ইত্যাদি।

(৪) পুনরাবৃত্তিতে বহুবচন হয়। যেমন— বনে বনে, থোকা থোকা ইত্যাদি।

(৫) নির্দেশক ব্যবহার করে বহুবচন গঠন করা হয়। যেমন— গুলি, গুলো ইত্যাদি।

(৬) আগে ও পরে বহুত্ববাচক শব্দ যোগে বহুবচন হয়। যেমন— সবপাখি, নানাজন, পুষ্পমালা ইত্যাদি।

৫.৫ লিঙ্গ

লিঙ্গ শব্দটির অর্থ নির্দেশক বা চিহ্ন। সমস্ত পৃথিবীতে বস্তু বা প্রাণী, পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব—এই তিনটি শ্রেণির অন্তর্গত। সাধারণত লিঙ্গ বাদে সজীব প্রাণীবাচক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও কোনো কোনো ভাষাতে কিছু নির্জীব বস্তুর নির্দেশও পাওয়া যায় লিঙ্গ থেকে। বহু ভাষায় বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় ও বিভক্তির দ্বারা নাম শব্দে লিঙ্গ দেখানো হয়ে থাকে। আমাদের দেশে পুরুষ-জাতীয় বস্তু বা প্রাণীকে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী-জাতীয় বস্তু বা প্রাণীকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীব বা নপুংসক-জাতীয় বস্তু বা প্রাণীকে বলে ক্লীবলিঙ্গ।

বাংলা ভাষাতে এই তিন ধরনের লিঙ্গভেদ প্রতিষ্ঠিত হলেও আভিধানিক বা ব্যবহারিক দিক থেকে ক্লীবলিঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই সংস্কৃত, হিন্দি ও জার্মান প্রভৃতিতে বিশেষ্যের লিঙ্গভেদ অনুযায়ী বিশেষণ এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়ারও লিঙ্গভেদ ঘটে, কিন্তু আধুনিক বাংলায় বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার নেই।

প্রাচীন বাংলায় নাম পদে 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক পদ গঠন করা হত, যেমন— হরিণা > হরিণী, নর > নারী ইত্যাদি। মধ্য বাংলায় বিশেষত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চর্যার মতো প্রাণীবাচক শব্দে বিশেষণে লিঙ্গভেদ ছিল। কৃদন্ত অতীতে সব ধরনের ক্রিয়াপদে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যুক্ত হতো, যেমন— বড়ায়ি, চলিলী, নিয়োজিলী ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় লিঙ্গের প্রভেদ খুব বেশি দেখা গেল না। তৎসম, অর্ধ-তৎসম শব্দে সংস্কৃতের মতো— 'আ', '-ইকা', '-ই', '-ঈ', '-নী' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রয়োগ শিষ্ট বাংলায় রয়ে গেল। খাঁটি বাংলায় বাস্তব অনুসরণেই লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এখানে অর্থগত ভাবই প্রধান।

৫.৬ লিঙ্গের প্রকারভেদ ও লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে বাংলা ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এছাড়াও অনেকে উভয় লিঙ্গর কথাও বলেছেন।

লিঙ্গ নির্ণয় পদ্ধতি দুই প্রকার হয়ে থাকে— শব্দভিত্তিক ও বাক্যভিত্তিক। বাংলায় বাক্যভিত্তিক লিঙ্গ নির্ধারণের চল নেই, তবে শব্দের উপর ভিত্তি করে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় মোটামুটি তিনটি উপায়ে—

(১) পুরুষবাচক বা পৃথক শব্দ দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন— বাবা-মা, ভাই-ভাজ, শ্বশুর-শাশুড়ী, বাদশা-বেগম, ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা ইত্যাদি।

(২) স্ত্রীবাচক বা সাধারণ শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ বোঝাতে স্ত্রী বাচক শব্দ প্রয়োগ করে। যেমন— পুরুষ-মহিলা, মদ্দা-মাদি, সৈন্য-মেয়ে সৈন্য ইত্যাদি।

(৩) পুরুষবাচক নামের শেষে প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক নাম গঠন করে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। যেমন— 'ঈ' 'ইন', 'ইনী' যোগে— সখা-সখী, চাতক-চাতকিনী, বামন-বামনী ইত্যাদি।

'আ' প্রত্যয় যোগে— তনয়-তনয়া, নবীন-নবীনা, অচল-অচলা ইত্যাদি।

'আনী' প্রত্যয় যোগে— বরুণ-বরুণানী, মাতুল-মাতুলানী, ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী।

বাংলা ভাষাতে অপ্রাণীবাচক শব্দেও অনেক সময় লিঙ্গান্তরের সাহায্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভেদ করা হয়ে থাকে। যেমন— ঘড়া-ঘড়ী, খোন্তা-খুন্তী, জাঁতা-জাঁতি, বোচকা-বুচকী ইত্যাদি।

৫.৭ পুরুষ

রূপতত্ত্বে পদ গঠনের একটি পর্যায় হল সর্বনাম। পদবিন্যাসে নামপদ বা বিশেষ্যপদের পরিবর্তে যে সমস্ত পদ ব্যবহার করা হয় তাদের সর্বনাম পদ বলা হয়। এই সর্বনামের নানা প্রকারের মধ্যে অন্যতম হল পুরুষ বাচক সর্বনাম। একটি শব্দ বা পদ গঠনের সময় কাজ কে করছে তার উপর নির্ভর করে শব্দ নির্মিত হয়। সে কারণে কোন পুরুষ শব্দটি ব্যবহার করছে তার উপর নির্ভর করে শব্দ নির্মাণ হয়ে থাকে। অনেকে 'পুরুষ' শব্দটিকে নিয়ে আপত্তি করেছেন একে অনেকে পুরুষ না বলে পক্ষ বলেছেন।

৫.৮ পুরুষের প্রকারভেদ

বাংলা সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে পুরুষ তিন প্রকার— ১. উত্তমপুরুষ, ২. মধ্যম পুরুষ ও ৩. প্রথম পুরুষ। বাংলাতে পুরুষের কোনো প্রকার লিঙ্গ ভেদ নেই। বাংলা সর্বনামের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—কর্তৃকারকে শব্দের যে রূপটি ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অন্য কারকের পদ গঠিত হয় না। অন্য কারকের জন্য অর্থাৎ চিহ্ন যোগ করার জন্যে শব্দটির একটি প্রাতিপদিক রূপ ব্যবহৃত হয়। ফলে সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বনামের দুটি রূপ; কর্তৃ কারকের একবচনে একপ্রকার এবং অন্য সব ক্ষেত্রে প্রাতিপাদিকের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত রূপ যুক্ত হয়। যেমন— আমি > আমাকে, সে > তার, তুমি > তোমাকে।

১. উত্তম পুরুষ: সংস্কৃত উত্তম পুরুষের শব্দ 'অস্মদ' বাংলায় 'আমি'। এই 'আমি' শব্দের সঙ্গে কোনো বিভক্তি যুক্ত হয় না। যে দুটি শব্দ 'আমি'-র প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত হয় সে দুটি হল 'আমা' এবং 'মো', এই দুটি শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়। উত্তম পুরুষ 'আমি' যার প্রাতিপদিক, 'হামি' 'মই',

'মুই' এর একবচন রূপ এইগুলিই। বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রাতিপদিক 'আমা-সঙ্গে 'র' বিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয় 'আমরা', আবার 'আমা' প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'দে', 'দিস', 'রা', 'দের', বিভক্তি যুক্ত হয়ে বহুবচন—আমাদের, আমাদিগকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

২. মধ্যম পুরুষ: মধ্যম পুরুষ সর্বনামের ক্ষেত্রে তিনটি রূপ প্রচলিত, তুচ্ছার্থে তুই, ঘনিষ্ঠার্থে তুমি ও সম্মানার্থে আপনি। 'তুই' এটি মূলত বাংলা একবচনের রূপ। সাধারণত আদর, তুচ্ছার্থে বা নিকট সম্বন্ধ বোঝাতে তুই ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন রূপ 'তোরা', 'তোদের'। 'তুমি' সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এবং বহু প্রচলিত মধ্যম পুরুষের পদ 'তুমি'। বহুবচনের ক্ষেত্রে 'তোমা' প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি জুড়ে— 'তোমরা', 'তোমাকে', 'তোমাদিগকে', 'তোমাদের' ব্যবহৃত হয়।

৩. প্রথম পুরুষ: উত্তম পুরুষের আমি বাচক এবং মধ্যম পুরুষের তুমি বাচক শব্দগুলো ছাড়া যাবতীয় পুরুষ বাচক শব্দই 'প্রথম পুরুষ' রূপে বিবেচিত হয়। প্রথম পুরুষের দুটি রূপ একটি সাধারণ, অন্যটি সমাত্মক। সাধারণ রূপটির একবচনে 'সে', বহুবচনে 'তা' প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'রা' বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'তারা' ব্যবহৃত হয়। প্রথম পুরুষের সম্মানার্থক কর্তৃকারকের একবচনের রূপ 'তিনি', বহুবচনের ক্ষেত্রে কর্তৃকারক ও তির্যক কারকের রূপ সাধারণ রূপের মতোই শুধু চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়ে 'তাঁরা' ব্যবহৃত হয়।

৫.৯ পুরুষ

এই এককে বাংলা রূপতত্ত্বের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করব। বাংলা শব্দ গঠন, বিভিন্ন রূপ জুড়ে গঠিত পদ সম্পর্কে ধারণা পাবে শিক্ষার্থী। বাংলা বচন, লিঙ্গ, পুরুষের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে এই এককে। উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা বচন, লিঙ্গ, পুরুষের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলেচানা প্রকাশ পেয়েছে এই এককে।

৫.১০ অনুশীলনী

(১) বাংলা বহুবচনের বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব বিষয়ে উদাহরণসহ আলোচনা কর।
(২) বাংলা লিঙ্গ প্রকরণ ও প্রকারভেদ আলোচনা কর।
(৩) বাংলা স্ত্রীলিঙ্গের ঐতিহাসিক বিবর্তন ব্যাখ্যা কর।
(৪) উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামের বিশেষত্ব দেখাও।
(৫) নির্দেশক সর্বনাম ও প্রথম পুরুষ সর্বনামের পর্ব বিভাগ করে এদের বিবর্তনের ধারা উল্লেখ কর।

৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(১) অলিভা দাক্ষী, ২০১৪, প্রাচ্য আর্যভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।
(২) উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ২০১৬, ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৩) কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা, কলকাতা।

(৪) জীবেশ নায়ক, ২০১৪, ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা, একুশ শতক, কলকাতা।

(৫) পবিত্র সরকার, ২০০৬, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৬) পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৭, ১৯৭১, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৭) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

(৮) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(৯) মহাম্মদ দানীউল হক, ২০০২, ভাষাবিজ্ঞানের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(১০) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), ২০১১, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(১১) সুকুমার সেন, ১৩৩৯, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা।

(১২) রামেশ্বর শ, ১৩৯৪, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

(১৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, নতুন দিল্লি।

একক ৬: কারক ও বিভক্তি

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ কারক

৬.৪ কারকের প্রকারভেদ

৬.৫ বিভক্তি

৬.৬ বিভক্তির প্রকারভেদ

৬.৭ কারকের প্রকারভেদ ও বিভক্তির প্রয়োগ

৬.৮ সারসংক্ষেপ

৬.৯ অনুশীলনী

৬.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠ রূপতত্ত্বের এলাকায় কারকের অবস্থান কোথায় তা জানা যাবে।
- ক্রিয়া পদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক কেমন তা জানা যাবে এই একক পাঠ করলে।
- কারকের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এই এককে।
- বিভক্তির অবস্থান শদ মধ্যে কেমন তা জানা যাবে এই একক পাঠে।
- কারক ও বিভক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থানগত সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে এই একক পাঠে।

৬.২ প্রস্তাবনা

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান উপায় হল ভাষা। এই ভাষা বাক্যের আকারে ব্যবহৃত হয়। বাক্য বলতে বোঝায় পদ সমষ্টি। বাক্যের মধ্যে অবস্থিত পদগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও বিশেষভাবে নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য এবং সর্বনামের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ক্রিয়াপদের। অন্যদিকে ক্রিয়ার সঙ্গে নামপদের সম্পর্ককে কারক বলা হয়। 'কারক' শব্দটি সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে। ইংরেজি 'case' শব্দের প্রতিশব্দ কারক। কিন্তু মনে রাখতে হবে সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক ও ইংরেজি ব্যাকরণের case-কিন্তু এক নয়। অন্যদিকে বিভক্তি হল শব্দ সাপেক্ষ। বিভক্তির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। এটি একটি বদ্ধ রূপ। শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দকে পদ গঠনে সাহায্য করে। মনে রাখতে হবে কারকের ক্ষেত্রে কারক থাকলেই সবসময় যে বিভক্তি থাকবে এমন নাও হতে পারে। অন্যদিকে বিভক্তি থাকলেই

তা কারকের বিভক্তি হবে তার কোনো অর্থ নেই। একই কারকের যে একই বা এক ধরনের বিভক্তি হবে তাও সম্ভব নয়।

৬.৩ কারক

সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির মতানুসারী বৈয়াকরণেরা বলে দেন 'ক্রিয়ান্বয়ী কারকম'। অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য পদের যে অন্বয় বা সম্পর্ক তা-ই কারক। বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ককে কারক বলে। কতগুলো পদ নিয়ে বাক্য, পদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক বস্তুত নাম ও ক্রিয়াপদের সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলি কেমন হয়ে থাকে? কেউ ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে, তাতে প্রকাশ করছে যে শব্দ—তা কর্তৃকারক। যে-ব্যক্তি বা বস্তু ক্রিয়ার দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তার প্রকাশক শব্দটি হচ্ছে কর্মকারক। ক্রিয়া সম্পাদনে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সহায়তা নেওয়া হচ্ছে, তাদের অর্থবোধক শব্দটি আসছে করণকারকে। কারও উদ্দেশ্যে বা নিমিত্ত কাজটি ঘটছে-প্রকাশক শব্দটি সেখানে সম্প্রদান। কোনো উৎস থেকে ক্রিয়াটির উদ্ভব, বা ভিন্নতা ঘটছে, সেই শব্দটি অপাদান কারক। যে স্থান বা কাল ইত্যাদির পটভূমিকায় কাজটি ঘটছে, তার সম্পর্ক বাচক শব্দটি হচ্ছে অধিকরণ কারক। অর্থাৎ যিনি কাজ করেন তিনি কর্তৃকারক, কর্তা যা করেন তা কর্ম, যার দ্বারা করেন তার করণ, যার জন্য করেন তা নিমিত্ত, সেখানে বা যে স্থানে কাজটি সম্পন্ন হয় তা অধিকরণ, যা থেকে হয় তা অপাদান কারক।

৬.৪ কারকের প্রকারভেদ

সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে কারক আট প্রকার। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে কারকের ছয় প্রকার বিভাজনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যথা— কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক। এছাড়াও আছে দুটি পদ সম্বন্ধ ও সম্প্রদান। এই দুটিপদ অনেকের মতে কারক স্থানীয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। সংস্কৃত মতে পদ কারক নয়, কারণ পদের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সঙ্গে শব্দটির কোনো সম্বন্ধ ঘটে না, সম্বন্ধ ঘটে বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে। সম্বোধনে আবার সম্বোধন শব্দটি যেন বাক্যের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে, মূল বাক্যের সঙ্গে কোনোভাবে অন্বিত হয় না। ফলে এগুলি পদ, কারক নয়। তবে মনে রাখতে হবে 'পদ' কথাটির এখানে পারিভাষিক অর্থ আলাদা। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ মাত্রই পদ-এটি সেই পদ নয়। এখানে কারক বনাম পদ; আর ওখানে শব্দ বনাম পদ। ইউরোপীয় মতে সবই 'কেস', কারণ সেখানে 'কেস' মূলত শব্দের প্রকট রূপ নির্ভর। বাক্যে ব্যবহৃত হতে গেলে বিশেষ্য বা সর্বনাম যে অন্যরকম একটু চেহারা নেয়-সেই চেহারার চিহ্ন হল 'কেস'।

৬.৫ বিভক্তি

যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়, তাকেই বিভক্তি বলে। বর্ণাত্মক ব্যাকরণে

বিভক্তিগুলি হল এক একটি বদ্ধরূপ। বিভক্তি সবসময় কোনো শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব বা নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দকে অর্থে পরিণত হতে সাহায্য করে। বাংলা ভাষায় যে সমস্ত বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি মূলত সংস্কৃত, প্রাকৃত থেকে নেওয়া। এই বিভক্তিগুলির কাজ শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদ গঠনে সাহায্য করা। বাক্যের পদগুলোকে পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত করা ও কারক নির্ণয়ে সাহায্য করা।

৬.৬ বিভক্তির প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় বিভক্তি দুই প্রকার— শব্দ বিভক্তি ও ধাতু বিভক্তি বা ক্রিয়া বিভক্তি। যে বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নামপদ গঠন করে তাকে বলে শব্দ বিভক্তি। আর যে বিভক্তি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে তাকে ধাতু বা ক্রিয়া বিভক্তি বলে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বিভক্তি শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ ও ধাতুকে বিশেষ অর্থ দান করে। এছাড়া পদ-রূপ বিভক্তিগুলিকে বলে অনুসর্গ, পরসর্গ। এদেরও পৃথক অস্তিত্ব আছে। বাংলা ভাষায় প্রকৃত বিভক্তি মাত্র চারটি-‘এ’, ‘ক’, ‘ত’, ‘র’ এবং এদের যোগাযোগে গঠিত আরও কয়েকটি। এদের মধ্যে শুধুমাত্র-‘এ’ বিভক্তি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিভক্তি চিহ্নের ক্রমবিবর্তিত রূপ, অন্যান্য বিভক্তিগুলি অনুসর্গীয় শব্দের ধ্বংসাবশেষ রূপে রয়েছে। তাই ‘ক’, ‘ত’, ‘র’, অনুসর্গীয় বিভক্তি রূপে অভিহিত হতে পারে। এছাড়াও শব্দবিভক্তির অন্তর্গত আরও দুটি প্রকারের বিভক্তি দেখা যায়। শূন্য বিভক্তি ও তির্যক বিভক্তি।

বাংলা ভাষায় যে সমস্ত পদে বিভক্তি চিহ্ন দেখা যায় না, সেখানে ‘অ’ বিভক্তি কল্পনা করে নেওয়া হয়, এই অদৃশ্য বিভক্তিটি হল শূন্য বিভক্তি। অপরদিকে যে বিভক্তি সব কারকেই যুক্ত হয় এবং যেকোনো পদকে ক্রিয়ার সঙ্গে তীর্যক ভাবে সঞ্চিত করে তাকে তির্যক বিভক্তি বলে।

৬.৭ কারকের প্রকারভেদ ও বিভক্তির প্রয়োগ

ক) কর্তৃকারক— আধুনিক বাংলায় কর্তৃকারকে কেবলমাত্র অনির্দিষ্ট কর্তা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, (এ, তে বিভক্তি) অনির্দিষ্ট কর্তা এসেছে মূলের অনুক্ত কর্তা থেকে। যেমন— লোকে বলে, পাগলে বলে, বাঘে খায় ইত্যাদি। বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষা আছে। বঙ্গালী ও কামরূপী উপভাষাতে নির্দিষ্ট কর্তায় ‘এ’ বিভক্তি বসে। যেমন রামে খায়, মায়ে ডাকে। সংস্কৃতে ‘অ’ কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে কর্তার একবচনে বিভক্তি ছিল ‘য’। প্রকৃতে এই ‘য’ লোপ পেয়েছে, নয় ‘এ’ হয়েছিল। ড. সুকুমার সেন সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন— পুত্রঃ > পুত্তে > পুত > পুৎ।

খ) কর্মকারক—আধুনিক বাংলায় কর্ম দু-প্রকার মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম। মুখ্যকর্ম অপ্রাণীবাচক ও গৌণকর্ম প্রাণীবাচক। মুখ্যকর্মে কোনো বিভক্তি যুক্ত হয় না। যেমন—সে আম খাচ্ছে। গৌণকর্মে সাধারণত ‘কে’ বিভক্তি বলে যেমন সে রামকে বইটি দিল। বাংলা সহ ওড়িয়া, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায়

গৌণকর্মেও সম্প্রদান কারকে এবং সম্বন্ধ পদে 'ক' বিভক্তি দেখা যায়। এই 'ক' এসেছে সংস্কৃত 'কৃত' থেকে। প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে বিভক্তি নেই। অর্থাৎ সংস্কৃতের 'ম' বিভক্তি ধ্বনি পরিবর্তনবশে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই কর্তা ও কর্ম এক প্রকার।

গ) করণ কারক— সাধারণভাবে আমরা জানি করণ কারকের বিভক্তি চিহ্ন হল দ্বারা, দিয়া কর্তৃক। বিভক্তি চিহ্ন বুঝে কারক নির্ণয় করতে হয়। তবে আধুনিক বাংলা থেকে প্রাচীন বাংলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিভক্তি চিহ্ন এক ছিল না। যেমন করণ কারকের বিভক্তি—'এঁ', 'এ' প্রাচীন বাংলায় যার বহুল প্রয়োগ ছিল, '-এন' থেকে। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, ''কর্মপদের সঙ্গে দিয়া এক অধিকরণ পদের সঙ্গে করিয়া ব্যবহার করিয়া ও করণ কারকের অর্থ প্রকাশিত হয়।''

ঘ) সম্প্রদান কারক— বাংলা ভাষায় সম্প্রদান কারক বোঝায় যাকে স্বত্বত্যাগ পূর্বক কোনো কিছু দেওয়া হয়, যা কখনো ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। যেমন— সুনামী ত্রাণে অর্থ দাও। এখানে কর্মকারকের মতো 'কৃত' থেকে 'ক' প্রত্যয় বিভক্তি এসেছে। আধুনিক বাংলায় নিমিত্তে 'এ' বিভক্তিরও ব্যবহার আছে। যেমন—'অন্ধজনে দেহ আলো'।

ঙ) অপাদান কারক— আধুনিক বাংলায় অপাদান কারকে 'হইতে' ও 'থেকে' বিভক্তি যুক্ত হয়। সংস্কৃতে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হত। সুকুমার সেন-এর মতে বাংলায় অপাদান কারক নেই। তাই তার বিশিষ্ট বিভক্তি চিহ্নও নেই। প্রাচীন বাংলায় 'হুঁ' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন— 'খেপহুঁ'। বাংলায় এই বিভক্তি লোপ পেয়ে গেছে। তবে ওড়িয়া ভাষাতে এই বিভক্তি এখনো প্রচলিত আছে।

চ) অধিকরণ কারক— আধার বোঝাতে অধিকরণ কারক ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে অধিকরণ কারকের বিশিষ্ট বিভক্তি ছিল 'এ'। বাংলায় তা লোপ পায়। বাংলায় যে 'এ' বিভক্তি হয় সেটি সংস্কৃত 'এ' বিভক্তি নয়। এটি সংস্কৃত 'হি' থেকে আগত -'এ' বিভক্তি। কালবাচক অর্থে অধিকরণ কারকে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন-'আজকে তোমায় দেখতে যাওয়া হবে না।' অধিকরণ কারকে বিভক্তি চিহ্নের লোপ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

বাংলায় যেহেতু সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না, তাই সম্বন্ধপদের আলোচনা করা হল না। তবে সংস্কৃতে সম্বন্ধ পদের জন্য ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দিষ্ট ছিল। বাংলায় সম্বন্ধ পদের শেষে 'র', 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়।

৬.৮ সারসংক্ষেপ

এই এককে আমরা বাংলা কারক, বিভক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই একক পাঠ করলে শিক্ষার্থী বাংলা কারক-বিভক্তির সংজ্ঞা, স্বরূপ, প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবে। মূল ছয়টি বাংলা কারকের গঠন, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। এই

একক পাঠ করলে বাংলা কারক-বিভক্তির স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং কারক-বিভক্তি নির্ণয় করতে পারবে।

৬.৯ অনুশীলনী

১. কারকের ঐতিহাসিক উৎস কী? বাংলা কারকের গঠন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২. বাংলা কারক বিভক্তির পরিচয় ও উভয়ের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৩. প্রত্যয় ও বিভক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

৪. কারক কাকে বলে? কারকের সঙ্গে পদের সম্পর্ক কী? কারক কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখো।

৬.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১) অলিভা দাক্ষী, ২০১৪, প্রাচ্য আর্যভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

২) উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ২০১৬, ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩) কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা, কলকাতা।

৪) জীবেশ নায়ক, ২০১৪, ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা, একুশ শতক, কলকাতা।

৫) পবিত্র সরকার, ২০০৬, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬) পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৭, ১৯৭১, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৭) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

৮) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৯) মহাম্মদ দানীউল হক, ২০০২, ভাষাবিজ্ঞানের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১০) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), ২০১১, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১১) সুকুমার সেন, ১৩৩৯, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা।

১২) রামেশ্বর শ, ১৩৯৪, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, নতুন দিল্লি।

একক ৭ : বাক্যের গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ ভাষার একক ও বাক্য

৭.৪ বাক্য গঠনের প্রাথমিক নিয়ম

৭.৫ বাক্য গঠনের প্রথানুসারী শর্ত

৭.৬ গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ

৭.৭ অর্থানুসারে বাক্যের প্রকারভেদ

৭.৮ সারসংক্ষেপ

৭.৯ অনুশীলনী

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

- বাক্য সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এই একক পাঠে
- ভাষার এককে বাক্যের স্থান কেমন তা জানা যাবে এই একক পাঠে।
- বাক্য গঠনের সাধারণ বিষয়গুলি কী কী তা জানা যাবে।
- বাক্য সম্বন্ধীয় আলোচনায় তিনটি স্তর— প্রথাগত, সাংগঠনিক ও অর্থগত মানদণ্ড কেমন তা জানা যাবে এই এককে।

২.২ প্রস্তাবনা

ইংরেজি 'Syantax' শব্দের বাংলা হল অন্বয়। 'Syantax' শব্দটির অর্থ সুবিন্যস্তকরণ। অন্বয় বা বাক্যের ক্ষেত্রে শব্দের সুবিন্যস্তকরণ হল বাক্যের আলোচ্য বিষয়। ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রাচীন স্তরে বাক্য মধ্যে বিন্যস্ত শব্দগুলির ক্রমপর্যায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ তখন রূপের বা শব্দের গঠনেই শব্দের পর্যায়ে চিহ্নিত হয়ে থাকত। সংস্কৃতে ভাষার 'শব্দ' এবং 'পদ' এই দুটি বিষয়ের পরিচয় পাই। পূর্বে শব্দের সঙ্গে শ্রেণি নির্ণায়ক বিভক্তি চিহ্নের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সেই শব্দগুলোই যখন বাক্যে বিন্যস্ত হত তখন সেগুলিকে বিভক্তি বলে গ্রহণ করা হত। এই বিভক্তি চিহ্নিত করে দিত কোনটি কর্তা, কোন্‌টি কর্ম, কোন্‌টি ক্রিয়া। বিভক্তি যুক্ত শব্দ পদ নামে পরিচিত হত। এই পদই পরে বাক্যে রূপান্তরিত হয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—''যে পদ বা শব্দ সমষ্টির দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকটিত হয়, সেই পদ বা শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলে।" অর্থাৎ সহজ করে বলতে গেলে মনের পূর্ণ ভাব প্রকাশক পদ সমষ্টিকে বাক্য বলে। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ বা মূলরূপ হুবহু বসলেই বাক্য হয় না। তাদের ব্যবহারের বিশেষ রীতি আছে। সেগুলিই বর্তমান এককের আলোচনার বিষয়বস্তু।

এছাড়াও বর্তমান এককে বাক্যের মধ্যে বিন্যস্ত উপাদানগুলির বিশ্লেষণ এবং প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে তিন ধারায়, যথা—প্রথাগত, সাংগঠনিক ও অর্থতাত্ত্বিক ভাবে। বাক্য গঠনের এই নিয়ম কিংবা পদ্ধতিকে একত্রে বাক্যতত্ত্ব বলা হয়।

৭.৩ ভাষার একক বা বাক্য

যে কোনো ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি আর বৃহত্তম একক হল বাক্য। 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে ভর্তৃহরি বাক্যকে অখণ্ড বলে মনে করেছেন। অনেকে বাক্যের পরিবর্তে 'কথোপকথন' (Discourse) কে ভাষার বৃহত্তম একক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাদের মতে কর্তা, কর্ম, প্রসঙ্গ ও সম্পর্ক এই চতুষ্কোণের মাধ্যমে কথোপকথন বিশ্লেষণ, বাক্যের কাঠামো ও অর্থ নির্ধারণের প্রসঙ্গকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এই তত্ত্ব তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। বাক্যই ভাষার বৃহত্তম একক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে এখনও পর্যন্ত।

৭.৪ বাক্য গঠনের প্রাথমিক নিয়ম

বাক্যের দুটি অংশ এবং এই দুটি অংশ যে কোনো বাক্যে থাকা একান্ত আবশ্যক। সে দুটি হল উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যে যার উদ্দেশ্যে বা সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তা উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তা বিধেয়। যেমন— 'ছেলেটি পড়ছে'; এই বাক্যে 'ছেলেটি' উদ্দেশ্য আর 'পড়ছে' হল বিধেয়। বাংলা বাক্যে সাধারণত প্রথমে উদ্দেশ্য, পরে বিধেয় থাকে। সমাপিকা ক্রিয়াই বাক্যের প্রধান বিধেয় আর সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা উদ্দেশ্য। অনেক সময় বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের প্রসারক থাকে। যে শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ উদ্দেশ্যের আগে বসে উদ্দেশ্যকে বিশেষিত করে তাকে উদ্দেশ্যের প্রসারক বলে। আর যে শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ বিধেয়ের আগে বসে বিধেয়কে বিশেষিত করে তাকে বিধেয়ের প্রসারক বলে। 'অমনোযোগী ছাত্রেরা মন দিয়ে পড়া করে না' যাকে 'অমনোযোগী' উদ্দেশ্য অর্থাৎ 'ছাত্রেরা'-র প্রসারক আর 'মন দিয়ে' বিধেয় 'পড়া করে না'-র প্রসারক। প্রসারক বাক্যের সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক একটি বিষয়। প্রসারক না থাকলেও বাক্য গঠনের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

৭.৫ বাক্য গঠনের প্রথানুসারী শর্ত

'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে বিশ্বনাথ কবিরাজ বাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—'বাক্যাংস্যাদযোগ্যতা-কাঙ্খাসত্তিযুক্ত: পদোচ্চয়।' অর্থাৎ বাক্য গঠনের প্রধান তিনটি শর্ত হল— ১. যোগ্যতা, ২. আকাঙ্ক্ষা, ৩. আসক্তি।

১. **যোগ্যতা**— বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থসঙ্গতি আবশ্যিক। অন্যথায় বাক্য গঠন সঙ্গতির অভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। তাই বাক্যের পদগুলোর অবশ্যই অর্থগত ও ভাবগত সঙ্গতি থাকা চাই। অর্থগত বা ভাবগত বাধার ক্ষেত্রে পদগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গত করে বসালেই বাক্য হবে না। যেমন 'রাতের বেলা সূর্য উঠেছে' বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে সঠিক হলেও অর্থানুসারে বাক্য নয়।

২. **আকাঙ্ক্ষা**— কোনো উক্তি বা বাক্যের উদ্দেশ্য গ্রহণে শ্রোতার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ না মেটে, যতক্ষণ অর্থপূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যে অন্য পদের প্রয়োজন থাকে। বাক্যের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই পদের অবস্থান হয়। যেমন— 'আমি কাল রাস্তাই'—এই টুকু বললে অর্থপূর্ণ হয় না, বা আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না 'সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম'—বললেই অর্থটি সম্পূর্ণ হয়।

৩. **আসক্তি**— বক্তার কথা সুচারুভাবে তুলে ধরতে পদগুলোকে অর্থানুসারে সাজানো প্রয়োজন, যাতে পদগুলোর সম্বন্ধ থাকে। ভাষার যে স্বাভাবিক নিয়ম, সেই নিয়মে পরপর প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ তাদের আসক্তি বা নৈকট্য রক্ষিত হয়। যেমন— 'গেলেন হঠাৎ হয়ে বসন্তবাবু অজ্ঞান' বাক্যটির আসক্তি রক্ষিত না হয়ে বাক্যটি নিরর্থক হয়ে গেছে। সঠিক বাক্যটি হবে 'বসন্তবাবু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন।' আসক্তি বা নৈকট্য রক্ষার জন্য বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির মধ্যে ব্যাকরণ অনুমোদিত সঙ্গতি থাকা অবশ্যই দরকার।

৭.৬ গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকারের হয়। যথা— ক. সরল বাক্য, খ. জটিল বাক্য, গ. যৌগিক বাক্য।

ক. সরল বাক্য: যে বাক্য একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় নিয়ে গঠিত তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন— 'আমি ভাত খাব'। একাধিক উদ্দেশ্য বিশিষ্ট বাক্যও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়ার কারণে সরল বাক্য বলে পরিচিত হয়। যেমন— আমি, বাবা ও মা ভাত খাব।

খ. জটিল বাক্য: একটি প্রধান বাক্যখণ্ড এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড বাক্যের সহযোগে গঠিত বাক্য জটিল বাক্য। বাক্যের মূল বক্তব্য যে খণ্ডবাক্যে আবৃত সেটাই প্রধান খণ্ডবাক্য। খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত বা অধীনস্ত বক্তব্যের ধারক অপ্রধান খণ্ডবাক্য। 'যে পড়াশুনায় অমনোযোগী সে কখনো ভালো রেজাল্ট করতে পারে না'। এখানে 'সে কখনো ভালো রেজাল্ট করতে পারে না' অংশটি মূল বক্তব্যকে ধারণ করে তাই এটি প্রধান বাক্যখণ্ড। 'যে পড়াশুনায় অমনোযোগী' অংশটি অপ্রধান বাক্যখণ্ড কারণ খণ্ডটি প্রধান বাক্যখণ্ডের উপর নির্ভরশীল।

গ. যৌগিক বাক্য: দুই বা ততোধিক সরল, মিশ্র বাক্যকে যখন সংযোজক বা প্রতিষেধক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত করে একটা বাক্য গঠিত হয় ও পরে পূর্ণবাক্য হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। 'সে ভাত খেল' এবং 'সে সাইকেল নিয়ে স্কুলে গেল।' এখানে দুটি স্বাধীন বাক্যখণ্ড 'সে ভাত খেল' ' সে সাইকেল নিয়ে স্কুলে গেল' এবং সংযোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করেছে।

৭.৭ অর্থানুসারে বাক্যের প্রকারভেদ

অর্থের ভিত্তিতে বাক্যের পদ ও বাক্যাংশের সমাবেশ বিচারে বাক্যকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

ক. নির্দেশসূচক বাক্য— কোনো বাক্যের মধ্য দিয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে নির্দেশ করা কিংবা কোনো কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়, তাকে নির্দেশসূচক বাক্য বলে। যেমন—'অমিত বই পড়ে'।

খ. প্রশ্নসূচক বাক্য— যে বাক্যে কোনো কিছুর জন্যে প্রশ্ন করা হয়, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন— কি চাও? কোথায় যাবে? ইত্যাদি।

গ. প্রার্থনাসূচক বাক্য— যে সব বাক্যে কামনা, ইচ্ছা, প্রার্থনা প্রভৃতি বোঝায় সেই বাক্যকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন— ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ঘ. আজ্ঞাসূচক বাক্য— এ ধরনের বাক্যে আজ্ঞা, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ প্রভৃতি প্রকাশ করে। যেমন—ভালো মনের অধিকারী হও।

ঙ. কার্যকারণাত্মক বাক্য— যে বাক্যে কোনো নিয়ম, স্বীকৃতি, শর্ত, সংকেত দ্যোতিত হয় সে বাক্যকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে। এই ধরনের বাক্যে যদি, যদ্যপি প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন যদি তুমি আসো, তাহলে আমি যাবো।

চ. সংশয়বাচক বাক্য— যে বাক্যে বক্তার সন্দেহ বা সংশয় প্রকাশ পায়, তাকে সংশয়বাচক বাক্য বলে। এই ধরনের বাক্যে 'হয়ত', 'বুঝিবা', 'বোধ হয়', 'সম্ভবত' প্রভৃতি ক্রিয়া বিশেষণ যোগ করে বাক্য গঠিত হয়। যেমন— হয়তো আমি যাব না।

ছ. বিস্ময়বোধক বাক্য— যে বাক্যে আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, বিস্ময়, ক্রোধ, ঘৃণা, কাতরোক্তি ইত্যাদি দ্যোতিত হয় তাকে বিস্ময়বোধক বা আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন— ছিঃ! এমন কাজ কেউ করে; হায়! হায়! কী সর্বনাশ হল ইত্যাদি।

৭.৮ সারসংক্ষেপ

ভাষার অন্যতম একক বাক্য। ধ্বনি-শব্দ-পদ-ভর পর্ব পেরিয়ে বাক্য গঠিত হয়। বাংলা বাক্য গঠনের বিভিন্ন পর্যায়, প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাক্যগঠন প্রসঙ্গে প্রাচ্য আলোচকদের মতামত, শর্ত সম্পর্কেও সাধারণ ধারণা দেওয়া চেষ্টা করা হয়েছে এই পর্বে। গঠন অনুযায়ী ও অর্থানুসারে বাংলা বাক্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে উদাদরণ সহযোগে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষার্থী বাংলা বাক্যের গঠন, প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে এই একক পাঠের মাধ্যমে।

৭.৯ অনুশীলনী

১. প্রথানুসারী ব্যাকরণ ও সাংগঠনিক ব্যাকরণের তত্ত্ব অনুসারে বাক্যের ধারণাটি লেখ।

২. প্রথানুসারী ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা বাক্য গঠনের বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

৩. বাক্যখণ্ড কাকে বলে? বাক্যখণ্ডের বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ আলোচনা কর।

৪. বাক্য বলতে কী বোঝ? বাক্যের প্রকার ভেদ উল্লেখ করে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৫. বাক্য গঠনের নিয়মাবলী উল্লেখ কর। অর্থ অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণিবিভাগ কর।

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১) অলিভা দাক্ষী, ২০১৪, প্রাচ্য আর্যভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

২) উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ২০১৬, ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩) কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা, কলকাতা।

৪) জীবেশ নায়ক, ২০১৪, ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা, একুশ শতক, কলকাতা।

৫) পবিত্র সরকার, ২০০৬, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬) পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৭, ১৯৭১, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৭) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

৮) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৯) মহাম্মদ দানীউল হক, ২০০২, ভাষাবিজ্ঞানের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১০) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), ২০১১, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১১) সুকুমার সেন, ১৩৩৯, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা।

১২) রামেশ্বর শ, ১৩৯৪, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, নতুন দিল্লি।

একক ৮ : বাংলা বানান

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ বানান ভাবনার ইতিবৃত্ত

৮.৪ বানান সমস্যা

৮.৫ বানান সংস্কার

৮.৬ সারসংক্ষেপ

৮.৭ অনুশীলনী

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠে বাংলা বানান সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা যাবে।
- বাংলা বানান ভুলের সমস্যা ও সমাধানের একটি ধারণা লাভ করা যাবে।
- বাংলা বানান ভাবনার পূর্বাপর সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা পাওয়া যাবে এই একক পাঠে।
- বাংলা বানানের সমস্যা ও বর্তমানে বাংলা বানানের কী কী সংস্করণ করা যেতে পারে তার একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ এই এককে পাওয়া যাবে।

৮.২ প্রস্তাবনা

ভাষার শব্দগুলিকে লেখায় যথাযথ রূপে তুলে ধরাতেই লিপির ভূমিকা। দেখা যায় যে কোনো ভাষায় শব্দের লিখিত রূপে, প্রথাগত ভাবে প্রচলিত ধারারই অনুসরণ। এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। বিভিন্ন ভাষার বানান নিয়ে যে সমস্যা তার বেশির ভাগটাই ধ্বনি ও লিপির মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে আসে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই নিয়ম একই। বাংলা বানান ভাবনার একটি ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে বাংলা বানান সমস্যা আর তার সমাধান। বাংলা বানান সংস্কার ও সম্ভাবনা এই বিষয়কে কেন্দ্র করে গত শতকে দুই বার বিতর্ক তৈরি হয়েছিল— একবার দুই-তিনের

দশকে আর একটা আট-নয়ের দশকে। প্রথমবারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার প্রকাশ করেছিল 'বাংলা বানানের নিয়ম' নামে একটি পুস্তিকা। অন্যদিকে দ্বিতীয় বারে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে 'আকাদেমি বানান ও অভিধান' ও 'বানানবিধি' গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করে। প্রথম দফার থেকে দ্বিতীয় দফায় বাংলা বানান সংস্কারের জটিলতাটিকে খানিকটা হলেও আলগা করেছে। কিন্তু এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়েছে এমনটা বলা যাবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা তথা বাংলা বানানকে কাজে লাগাতে গিয়ে নিত্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বাংলা বানানকে। আর সেই সঙ্গে সময়ের উপযোগী নানা সমাধানও খুঁজে নেওয়ার প্রক্রিয়াও চালাচ্ছে বাংলা বানান।

৮.৩ বানান ভাবনার ইতিবৃত্ত

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'Bengali Spoken and Written' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন— বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘ স্বর নেই, ঞ-ণ-য-জ্ঞ নেই। সেই সঙ্গে ম-ফলা, য-ফলা, বিসর্গ ইত্যাদি নেই, অথচ বানানের ক্ষেত্রে এই বর্ণগুলির প্রয়োগ আছে। বলা বাহুল্য এই সময় থেকেই বানানে এসব বর্ণের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অ-তৎসম শব্দে এই সমস্ত বর্ণ বাদ দিয়ে উচ্চারণ মেনে বর্ণ প্রয়োগের কথা উঠে আসে এই সময় থেকেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ''শব্দতত্ত্ব'' গ্রন্থের 'বাংলা উচ্চারণ' ও 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে এবং ''বাংলা ভাষার পরিচয়'' গ্রন্থে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা বানান নিয়ে নানাবিধ আলোচনা করে এসেছেন।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ঙ্গ-ঙ, ণ-ন, জ-য ইত্যাদি বর্ণের প্রয়োগ নিয়ে লেখকদের মধ্যে অস্থিরতা লক্ষ করেন রবীন্দ্রনাথ এবং এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি সরাসরি প্রশ্নও তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'কলিকাতা বানান-সংস্কার-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বানান সমিতিতে যুক্ত হয় সেই সময়ের বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা, যেমন— যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ।

এই সময়ে বেশ কিছু বিশিষ্ট পণ্ডিতজনেরা একক চেষ্টায় বাংলা বানান ভাবনা বিষয়ে নিজস্ব মতামত রেখেছিলেন। দেবপ্রসাদ ঘোষ লেখেন 'বাঙালা ভাষা ও বানান' (১৯৪০)। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছিলেন 'বাংলা বানান' (১৯৭৮)। পরেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন 'বাঙালা বানান বিধি' (১৯৮২)। পবিত্র সরকার লিখেছেন 'বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা' (১৯৮৭)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির পরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে আবার বাংলা বানান ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এবার এই আলোচনা শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা

আকাদেমি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান বিধি প্রয়োগ ও প্রচলন নিয়ে নানা সময়ে বেশ কিছু বিতর্ক দেখা যায়। বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কৃত 'আকাদেমি বানান অভিধান' তারই ফল। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা আকাদেমি কুড়ি দফা বানানবিধি সম্বলিত প্রায় ১৫,০০০ শব্দের একখানি বানান অভিধান প্রকাশ করে। পরে বেশ কিছু সংস্করণে গ্রন্থের শব্দ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩,০০০-এর মতো হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি ও বাংলা আকাদেমির প্রচেষ্টা ছাড়াও আনন্দ বাজার পত্রিকাগোষ্ঠী একটি ব্যাবহারিক বাংলা বানানবিধি প্রকাশ করে। ফলে শ্যামাচরণ থেকে শুরু করে 'আকাদেমি বানান অভিধান' পর্যন্ত বাংলা বানান ভাবনার ইতিহাসটি বেশ দীর্ঘ।

৮.৪ বানান সমস্যা

বাংলা ভাষায় বানান সমস্যা সাধারণত দুই রকমের হয়ে থাকে— মূলগত এবং আরোপিত। মূলগত ধ্বনি ও বর্ণ তথা লিপির মধ্যে মিলের অভাব। বাংলায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরধ্বনি লিপিতে যথার্থভাবে নেই, উচ্চারণে প্রায় সবক্ষেত্রেই হ্রস্ব ও দীর্ঘ হতে পারে। সেজন্য কোনো ধ্বনিরই হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ না রাখাই সমীচীন। ব্যাকরণ আলোচনায় লিপি ও বর্ণ-সমার্থক দুটি শব্দের একটিকে অতিরিক্ত বোধে বর্জন করা যায়নি। অপরদিকে ঋ, ঌ, ঐ, ঔ ইত্যাদির জন্য পৃথক লিপি রাখারও কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। দ্বিস্বর, ত্রিস্বর ধ্বনির ক্ষেত্রে তো পৃথক লিপি নেই। এদের বানানে প্রচলিত স্বরচিহ্ন দেখা যায়। এর বিহিত হিসেবে স্বরচিহ্ন ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত করার রীতি কার্যকর করা। যেমন—'ি(ই)', 'ী(ঈ)', 'ু(উ)', 'ূ(ঊ)' 'ে(এ)', 'ৈ(ঐ)', 'ো (ও)', 'ৌ(ঔ)' ইত্যাদি। তবে দ্বিস্বর ধ্বনির মধ্যে মাত্র দুটির জন্য চিহ্ন প্রতীকের ব্যবস্থা না থাকলেও চলে।

ব্যঞ্জনধ্বনিতে -ঞ, ব (অন্ত্যস্থ), ৎ ঃ বর্ণের ব্যবহারিক অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ণ, ষ, স, ইত্যাদি বাংলা বর্ণ লিপির অঙ্গীভূত হয়ে আছে। শব্দ গঠনে প্রতীকরূপে এদের প্রয়োগ এখনো অনাবশ্যক করা হয়নি। ভাষার নিয়মেই ধ্বনি ও লিপির মধ্যে বৈষম্য কোনো না কোনোভাবে সবসময় থাকে। '-র', '-ল', ধ্বনির সংস্পর্শে অন্য ধ্বনির প্রভাবিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং ভাষার স্বাভাবিক নিয়মে তা বোধ্য এবং স্পষ্ট। মহাপ্রাণ ও অল্প প্রাণ ধ্বনির জন্য পৃথক লিপির অনাবশ্যকতা বোধে বর্ণ চিহ্নের পরিবর্তন চিন্তাও সেই রকম অযৌক্তিক।

যুক্তব্যঞ্জনের লিপি সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের জন্য রোমক লিপি পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলা হয়। কিন্তু গোড়াতেই স্মরণ করা যেতে পারে যে বাংলা যুক্তাক্ষর তথা যুক্তব্যঞ্জনের লিপিগুলি একদিক থেকে যথেষ্ট সহজ ও সংহত। ভাষায় প্রচলিত কিছু লিপির পরিবর্জন বাণিজ্যিক প্রয়োজনের তাগিদে হওয়া

বাঞ্ছনীয় নয়। সমাজ শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করে। তাই ধ্বনি বিজ্ঞানীর মতে বাংলার মতো অক্ষর ভিত্তিক লিপিমালা, ধ্বনি বচন লেখার দিক থেকে আদর্শ স্থানীয়। পদ, ধ্বনি, বর্ণ বা অক্ষর-এর যে কোনো একটি লিপি পদ্ধতিতে প্রাধান্য পায়। বাংলা ভাষায় ধ্বনি ও অক্ষরের মিশ্রণজাত লিপি পদ্ধতি প্রচলিত।

৮.৫ বানান সংস্কার

বানান সংস্কার ধারণাটি মুখ্যত ভাষার অভিজাত সংস্কৃতিবান ব্যবহারকারীদের কাছেই প্রাসঙ্গিক। কারণ সংস্কার অধিকারী এখানে ভাষার সামাজিক পরিসর। কোন সংস্থা বা গোষ্ঠীর স্বেচ্ছা নিয়োজিত বা ব্যক্তিক উদ্যোগ থেকে নিয়ম বিধি সংস্কারের ফতোয়া জারি করতে পারে না। তবে চর্চাকারীদের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতালব্ধ অসঙ্গতির দৃষ্টান্তগুলি সমাজদৃষ্টির গোচরে আসে, যা অসঙ্গত অবৈজ্ঞানিক ভাষার স্বাভাবিক স্ফূর্তির প্রতিবন্ধক তাদের শনাক্ত করে দেওয়াই চর্চাকারীর দায়িত্ব। কিন্তু শব্দের বানান পরিবর্তন-পরিমার্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেইমতো প্রচলন জারি করা, শব্দকোষ সঙ্কলন করার ব্যগ্রতা অস্বাভাবিক। তাতে নানারূপ আরোপিত রূপান্তর ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। ভাষার যে রীতি নীতি চলে তার আভ্যন্তর সূত্র শনাক্ত করাই ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ। ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ধ্বনি ও লিপির প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতির সূচনা করতে পার। প্রচলিত মান্যরীতির সঙ্গেই শুধু নয়, তার পরিধি বহু বিস্তৃত হতে পারে। ভৌগোলিক, সামাজিক, জনগোষ্ঠীগত পার্থক্য থেকে ধ্বনি, রূপ ও শব্দার্থগত দুস্তর পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সেখানে কিছু বৈষম্য ও ব্যতিক্রম থেকে যায়। বৈচিত্র্যগুলি বিবেচনায় এনে তুল্যমূল্য গুরুত্ব দিয়ে পূর্ণ সঙ্গতি বিধান সম্ভব হয় না। মান্য ভাষার মানদণ্ডে পরিগণন বিদ্যার প্রযুক্তি ব্যবহারের অনিবার্যতায় সঙ্গত নির্দেশিকাকে যুক্তিযুক্ত অনুসরণ করতে হবে।

শিশু মনে ভাষার অর্জন নিরূপিত হয় নির্দিষ্ট পরিবেশে শব্দ ভাষা বিধি অধিগত করার সূত্রে। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের ভাষিক শক্তির বিকাশ অন্যান্য জৈবিক বৃত্তি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সমান্তরাল। শৈশবে ভাষাশিক্ষার অগ্রগতি দুটি বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত—নিজ ভাষার রূপ গঠন ও ব্যক্ত করার বিধি নিয়ন্ত্রণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সৃজন ও অনুধাবন। ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কির মতে ব্যাকরণ সামর্থ্য অর্জনের পথে শিশুরা তাদের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গত-অসঙ্গত যোগ গড়ে তোলে। পরিবেশ তার জ্ঞাপন সামর্থ্য অর্জনের পক্ষে গুরুতর ভূমিকা পালন করে। বাংলা বানান সমস্যা নিয়ে যারা চিন্তাগ্রস্ত, তথাকথিত শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্তরাই লিখিত ভাষার উপযোগিতার সিংহভাগই গ্রহণ করেন, ভাষা বিকার তাঁদেরই হাত দিয়ে ঘটে। নথিভুক্ত রূপেই অশুদ্ধি ঘটে এবং সেখানেই তা শনাক্ত হয়। মৌখিক বা নিত্য ব্যবহার্য

ভাষায় তা ধরা যায় না, তার সাধারণ পটভূমিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা নেই। লিপিভুক্ত ভাষাতেই বানানের সমস্যা। এ যুগে শব্দ গঠন, বাক্য গঠন এবং ভাষাস্বরূপের অন্তর্গত সূত্র বা নিয়মাবলী গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

ভাষাপ্রযুক্তির পরিগণক ব্যবস্থা ভাষার নিয়ম অনুসারে চলতে কীভাবে পারবে, তা খুঁজে নিতে হবে তাকেই এবং তা সম্ভব। সামাজিক প্রচলনের গতি ধারায় ভাষা ও লিপির রীতিনীতি সর্বজনিক। সেই সব রীতিনীতির সূত্র নির্ধারিত হয় প্রচলিত ব্যাকরণ গ্রন্থে। উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিনীতি যার সূত্র পূর্ব নির্ধারিত, তাকে লঙ্ঘন করার কোনো যুক্তি নেই। যেটুকু পরিবর্তন ঘটে, তা ভাষার নিজস্ব গতিতে স্বাভাবিক ও অনিবার্য। তার জন্য উদ্বেগ ও অতি তৎপরতা অনাবশ্যক।

৮.৬ সারসংক্ষেপ

বাংলা বানানের গঠন, বানানাবিধি সংক্রান্ত নানান পর্যায়, নানান সংস্কার প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা লিপিগঠন, বানান গঠন, বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকের বানান সংক্রান্ত বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা বানান নির্ণয় সংক্রান্তসমস্যা (ধ্বনিসাম্য), বানান সংস্কারের বিবিধ রীতি, বানান বিধি সংক্রান্ত নিয়ম প্রসঙ্গে শিক্ষার্থী জ্ঞান লাভ করতে পারবে। বাংলা বানানের স্বাভাবিক পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে এই এককে।

৮.৭ অনুশীলনী

১) বাংলা বানান নিয়ে ভাবনা চিন্তার ইতিহাসটি আলোচনা কর।

২) বাংলা বানান সংস্কারের উপায়গুলি কি কি তা সূত্রাকারে আলোচনা কর।

৩) বাংলা বানান সমস্যা কত রকমের হতে পারে বলে তোমার মনে হয়? সেগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) অলিভা দাক্ষী, ২০১৪, প্রাচ্য আর্যভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

২) উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ২০১৬, ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩) কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা, কলকাতা।

৪) জীবেশ নায়ক, ২০১৪, ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা, একুশ শতক, কলকাতা।

৫) পবিত্র সরকার, ২০০৬, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬) পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৭, ১৯৭১, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৭) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

৮) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৯) মহাম্মদ দানীউল হক, ২০০২, ভাষাবিজ্ঞানের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১০) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), ২০১১, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১১) সুকুমার সেন, ১৩৩৯, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা।

১২) রামেশ্বর শ, ১৩৯৪, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, নতুন দিল্লি।

একক ৯ : সাধু ও চলিত ভাষা

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ বাংলা গদ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সাধু-চলিত রীতি

৯.৪ বাংলা গদ্যের সাধু রীতি ও তার বৈশিষ্ট্য

৯.৫ বাংলা গদ্যের চলিত রীতি ও তার বৈশিষ্ট্য

৯.৬ সারসংক্ষেপ

৯.৭ অনুশীলনী

৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

- এই এককে বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- বাংলা সাহিত্যিক উপভাষা কী কী তা আলোচনা করা হবে এই এককে।
- বাংলা সাহিত্যের গদ্যরীতি হিসেবে সাধু গদ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হবে এই এককে।
- চলিত গদ্যরীতি ও তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হবে এই এককে।
- সাধু রীতি ও চলিত রীতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়েও আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে।

৯.২ প্রস্তাবনা

প্রতিটি ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা ও সামাজিক উপভাষা আছে, ঠিক তেমনি প্রত্যেক ভাষাতে সাহিত্যিক উপভাষাও আছে। সাহিত্য রচনায় যে বিশেষ ধরনটি ব্যবহৃত হয় সেটিই ওই ভাষার সাহিত্যিক উপভাষা। এটি দৈনন্দিন মুখের ভাষা থেকে পৃথক। আবার প্রত্যেক ভাষাতে মৌখিক উপভাষা ও সাহিত্যিক উপভাষার উপাদান আছে। বাংলা ভাষাতেও আছে। মৌখিক ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য থাকলেও সাহিত্যিক উপভাষার কোনো আঞ্চলিক পার্থক্য থাকে না। এই উপভাষা এক ও অভিন্ন। মুখের ভাষার তুলনায় এটি স্থায়ী। এটি সাধারণত রক্ষণশীল। শব্দপ্রাচুর্যে, ভাব প্রাচুর্যে সাহিত্যিক উপভাষা অনেক বেশি সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে এই ভাষার সাহিত্যিক উপভাষা দুইটি—সাধু রীতি ও চলিত রীতি। সাধু রীতি মুখের ভাষা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। চলিত

রীতিটি বাঙালির মান্য উপভাষার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলা চলে। বাংলার এই দুই রীতির ইতিহাস বা বিবর্তন জানার আগে বাংলা গদ্যের ইতিহাসটি জেনে নেওয়া যেতে পারে।

৯.৩ বাংলা গদ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সাধু—চলিত রীতি

বাংলা গদ্য সাহিত্যের পত্তন অষ্টাদশ শতকে; বিদেশি পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকরা এই ধারার পথ-প্রদর্শক। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে আধুনিক বাংলার সূচনা ও গদ্যের পথ চলা শুরু। ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিচারেও বাংলা ভাষা প্রাচীন মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছে। প্রথম বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া যায় ষোড়শ শতকেই। নিদর্শন অহোম রাজাকে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের পত্র। এরপর পর্তুগালের লিবসনে বাংলা ভাষার প্রথম পুস্তক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩ খ্রিঃ) প্রকাশ পায়। এছাড়া হালহেডের ব্যাকরণেই প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়। বাংলা গদ্যে বাঙালির লেখা সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১)। এটিই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ, লেখক রামরাম বসু। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই কলেজ থেকে প্রায় ২৮ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা সাময়িকপত্রের প্রকাশ শুরু হয়। এই সময়ে সমাজ সচেতন, সংস্কারক, মধ্যবিত্ত বাঙালি মননের অন্যতম প্রতিভূ রামমোহন রায়, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখের আবির্ভাব হয়। ১৮১৮-৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় সত্তরটি সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। এগুলির মাধ্যমে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রস্তুতি অনেকটাই বিস্তার লাভ করে। এরপরে বাংলা গদ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাত ধরে। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে আনেন নিজস্ব ছন্দ-তাল, দেখালেন নমনীয়তা, লালিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে গল্প পিপাসু বাঙালি পাঠকের মনে কল্প-জগতের রত্ন সঞ্চার করেন। আরও পরে বাংলা গদ্যের রাজপথ নির্মাণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আরও 'আলালী' বা 'হুতোমী' গদ্যের সূত্র ধরে বিবেকানন্দের কথ্য রীতি, বীরবলের নেতৃত্বে চলিত গদ্য বাঙালি মনে নতুন জোয়ার আনে। আজও গদ্য বানান ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছে, তার প্রবাহ থেমে যায়নি—চলছেই।

আধুনিক বাংলায় লেখার ভাষাতে দুটি ছাঁদ রয়েছে তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম স্তরেও লেখ্য ও মুখ্য ভাষার ব্যবধান ছিল। লেখক-সাহিত্যিকরা ভাষার একটা শিষ্ট রূপ গড়ে তুলেছিলেন, যার মূল ভিত্তি মুখের ভাষা কিন্তু তা হুবহু মুখের ভাষা নয়। সাহিত্যের ভাষা গূঢ়ার্থে কৃত্রিম; তবে স্বাভাবিক নয়, সৃষ্ট। এর দুটি রূপ— প্রাচীনপন্থী দৃঢ়বদ্ধ ঐতিহ্যানুসারী— নাম 'সাধু' এবং অন্যটি মৌখিক ভাষার লঘু-শিষ্ট রূপ নাম চলিত। যা সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম বাহন হিসেবে স্বীকৃত। এই ভাষা রীতি একদা শুদ্ধ, শিষ্ট সাধুকে সরিয়ে দিয়েছে।

৯.৪ বাংলা গদ্যের সাধুরীতি ও তার বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতানুসারী যে গদ্য রীতি, কথ্য ভাষার পদ বর্জন করে উনিশ শতকের শুরু থেকে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে হয়ে উঠেছিল, তাকেই বলে সাধু ভাষা বা 'Standard Literatary Bengali' বা High Bengali। উনিশ শতকের শুরুতে দেশি-বিদেশি লেখকেরা গদ্য রচনায় উদ্যোগী হয়ে ভাষাকে আরও গুরুগম্ভীর করতে চাইলেন। মধ্যযুগের পদ্য রীতি অনুসারী শব্দ, রূপ, ক্রিয়া বিভক্তি, অনুসর্গ গ্রহণ করে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে আরবি, ফারসি ও কিছু দেশি শব্দ মিলিয়ে নতুন ভাষার একটি কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত চালে শব্দ ব্যবহারকেই গদ্যের সৌন্দর্য ও সামর্থ্যের চাবিকাঠি মনে করতেন। বস্তুত তাঁর লেখাতেই বাংলা সাধু গদ্যের প্রাথমিক রূপ ফুটে ওঠে। এরপরে রামমোহন সাধু গদ্যের যুক্তি নির্ভর রূপ নির্মাণ করেন। তিনি 'বেদান্ত' গ্রন্থে প্রথম সাধুভাষা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরে বিদ্যাসাগর গদ্যে শিল্প গুণ, ছন্দ স্পন্দন, আবেগ অনুভূতি পূর্ণ কাব্যময় ব্যঞ্জনা আনলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে করলেন আরও বিকশিত। রবীন্দ্রনাথ দিলেন বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য। এখন সাধুরীতির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে আলোচনা করা যেতে পারে—

১) সাধু রীতির গদ্য সমগ্র বাংলার সাধারণ সম্পদ। এর কোনো আঞ্চলিক রূপ নেই।

২) সাধু ভাষা সাহিত্যিক ভাষা, সাহিত্যের ভাষা। এর দুটি রূপ— একটি গভীর সংস্কৃতানুসারী। অন্যটি তরল অথচ মধুর।

৩) সাধু রীতি সংস্কৃত ভাষার প্রভাব জাত। তৎসম শব্দের বিপুল ব্যবহার ও সন্ধি, সামসবদ্ধ শব্দের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

৪) ক্রিয়াপদের প্রাচীনতর দীর্ঘ ও সম্পূর্ণ রূপ সাধু গদ্যে ব্যবহৃত হয়। করিয়াছিলাম, করিয়া, বলিয়া ইত্যাদি।

৫) সর্বনাম পদের ব্যবহার পূর্ণ রূপে ঘটে। তাহাদিগকে, আমাদিগের ইত্যাদি।

৬) প্রাচীন অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন— বলিয়া, যেহেতু ইত্যাদি।

৭) সাধু রীতির গদ্যে অলঙ্কারের প্রবণতা খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়।

৮) সাধু গদ্যে অপিনিহিতির পূর্ব যুগের ভাষারূপ ব্যবহৃত হয়।

৯) সাধু রীতিতে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার অনেক বেশি। যেমন— গমন করিবে, শ্রবণ করিবে ইত্যাদি।

১০) 'ল'-জাত ক্রিয়ার ব্যবহার বেশি দেখা যায় সাধু রীতির গদ্যে। যেমন— লই, লইবে, লইতেছে ইত্যাদি।

৯.৫ বাংলা গদ্যের চলিত রীতি ও তার বৈশিষ্ট্য

আধুনিক যুগে বিশেষত মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে কলকাতা ও ভাগীরথী নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষদের শিষ্ট মৌখিক ভাষার উপর ভিত্তি করে বাংলা চলিত ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। চলিত রীতি বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের নবীনতম ধারা। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে এর ব্যবহার শুরু হলেও বিশ শতকে এর সার্থক রূপ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের লেখাতে এই গদ্যরীতির যথার্থ পূর্ণতা পায়। চলিত রীতির ব্যবহার মানুষের আবহমান কালের বাক্‌ভঙ্গিতে, সাহিত্যে বা লেখ্য রূপে স্বীকৃতি পায় আধুনিক যুগে। রামরাম বসু প্রথম বলেছিলেন 'চলন' ভাষা, তা থেকে চলিত রীতি। এই চলিত ভাষা রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) চলিত গদ্যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ খুব কম দেখা যায়।

২) চলিত রীতিতে তদ্ভব, দেশি ও আঞ্চলিক নানা শব্দের অবাধ প্রয়োগ দেখা যায়।

৩) চলিতে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ততম রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন— করেছিল > কচ্ছিল, বলেছিল > বল্লে ইত্যাদি।

৪) সর্বনাম পদের রূপও সংক্ষিপ্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় চলিত রীতির গদ্যে। যেমন— আমাদিগের > আমাদের, তোমাদিগের > তোমাদের ইত্যাদি।

৫) যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারেও সংক্ষিপ্ততম রূপের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন— শ্রবণ করা > শোনা, অধ্যয়ন করা > পড়া ইত্যাদি।

৬) বাংলা প্রত্যয় যুক্ত শব্দের বাহুল্য চলিতে দেখা যায়। যেমন— মেয়েলি, বাবুগিরি, ছ্যাবলামি ইত্যাদি।

৭) চলিত গদ্যে অলঙ্কারবিহীন সরল ও ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

৮) ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ ব্যাপক হারে দেখা যায় চলিত গদ্যে। যেমন— ঝন্‌ঝন্, শন্‌শন্, হন্‌হন্ ইত্যাদি।

৯) চলিত গদ্যে আঞ্চলিক উপভাষার শব্দ ব্যবহার বা আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য রচনার প্রবণতা দেখা যায়।

১০) সাম্প্রতিককালে চলিত রীতিতে বানানের ক্ষেত্রে উচ্চারণগত মহিমাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন— একটি > এ্যাকটা, মেল > ম্যালা ইত্যাদি।

১১) চলিত রীতির গদ্যে বিদেশি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষত ইংরেজি শব্দাবলি চলিত গদ্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৯.৫ বাংলা গদ্যের চলিত রীতি ও তার বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষার, গদ্যের মূলত দুটি রীতি সাধু ও চলিত। এই এককে সাধু ও চলিত রীতির গঠিন, বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এইসূত্রে বাংলা গদ্যের উদ্ভব, বিকাশপর্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষার্থী এই একক পাঠের মাধ্যমে বুঝতে পারবে বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ধারাটি। উনিশ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চা থেকে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর্ব পেরিয়ে বিশ শতকের চলিত বাংলা গদ্যরীতির বিকাশ পর্যন্ত এক দীর্ঘকালের বাংলা ভাষার চলনরীতিরটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারণা তৈরি হবে।

৯.৭ অনুশীলনী

১) বাংলা গদ্যরীতির কটি রূপ? তাদের নাম উল্লেখ করে যে কোনো একটি রীতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

২) চলিত গদ্যরীতির বিবর্তন লেখ।

৩) সাধু ও চলিত ভাষারীতির তুলনামূলক আলোচনা কর। চলিত রীতির ভিত্তি মূলে যে উপভাষার অবদান আছে তার বিশেষত্বগুলো নির্দেশ কর।

৪) সাধু ও চলিত রীতির সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা কর।

৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) অলিভা দাক্ষী, ২০১৪, প্রাচ্য আর্যভাষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

২) উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ২০১৬, ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩) কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা, কলকাতা।

৪) জীবেশ নায়ক, ২০১৪, ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা, একুশ শতক, কলকাতা।

৫) পবিত্র সরকার, ২০০৬, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬) পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৮৭, ১৯৭১, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৭) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

৮) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৯৮, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৯) মহাম্মদ দানীউল হক, ২০০২, ভাষাবিজ্ঞানের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১০) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), ২০১১, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১১) সুকুমার সেন, ১৩৩৯, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ, কলকাতা।

১২) রামেশ্বর শ, ১৩৯৪, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, নতুন দিল্লি।

মডিউল ৩: বাংলা ছন্দ

একক ১০ : বাংলা ছন্দের পরিভাষা

একক গঠন :

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ মূলপাঠ: বাংলা ছন্দের পরিভাষা

১০.৩.১ বর্ণ, ধ্বনি

১০.৩.২ অক্ষর, দল

১০.৩.৩ মাত্রা, কলা

১০.৩.৪ যতি, ছেদ

১০.৩.৫ পর্ব, অতিপর্ব

১০.৩.৬ উপপর্ব

১০.৩.৭ পদ

১০.৩.৮ পঙ্ক্তি

১০.৩.৯ স্তবক, শ্লোক

১০.৩.১০ মিল

১০.৩.১১ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর

১০.৪ সারাংশ

১০.৫ অনুশীলনী

১০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

১) এই এককের উদ্দেশ্য হল বাংলা কবিতায় ছন্দ-প্রয়োগের পরিচিতির প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ।

২) ছন্দবিচার বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন ছন্দের পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচিতি।

৩) এই এককে আমরা দেখে নেব পারিভাষিক শব্দগুলির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা।

১০.২ প্রস্তাবনা

ছন্দ নিয়ে আলোচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছন্দ-পরিভাষা ও ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই বিতর্ক এড়ানোর একমাত্র উপায় হল এমন নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা, যা সবার কাছে মান্য হতে পারে, যার প্রয়োগে বাংলা ছন্দের সূত্র এবং তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীর কাছে একটিমাত্র রূপ নিয়ে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হতে পারে। বাংলা ছন্দচর্চায় অগ্রণী ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন আর অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা দুটি পৃথক স্রোতে প্রবাহিত হলেও কিছু কিছু পরিভাষা দুজনের কাছেই গ্রাহ্য।

ছন্দ:

কবিতাকে শ্রুতিমধুর করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতিকে কেউ বলতে চান 'ছন্দ'। কারোর মতে ছন্দ হল 'উচ্চারণ আর বিরামের সুশৃঙ্খল আবর্তনময় বিন্যাস'। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে 'সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্‌বিন্যাসের নাম ছন্দ।' 'শৃঙ্খলা', 'পরিমিতি', 'নিয়ন্ত্রণ' যা-ই বলি না কেন, ছন্দের মূল কথা এক নিয়মবদ্ধ প্রণালী। এই রীতি, শৃঙ্খলা, বিন্যাসের পদ্ধতি জানতে হলে প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে নির্দিষ্ট কিছু পারিভাষিক শব্দের পরিচয়, যা দিয়ে গড়ে ওঠে ছন্দের শরীরী গঠন।

১০.৩ মূলপাঠ: বাংলা ছন্দের পরিভাষা

১০.৩.১ বর্ণ, ধ্বনি

আমরা যা উচ্চারণ করি, তার লিখিত চিহ্নের নাম হরফ বা বর্ণ। অর্থাৎ, ধ্বনির লিখিত রূপকেই বর্ণ বলে। বর্ণের উচ্চারিত রূপটিই ধ্বনি। ছান্দসিকের ভাষায় বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ। প্রবোধচন্দ্র বর্ণকে বা ধ্বনিকে সরাসরি স্বর-ব্যঞ্জনে ভাগ করেননি। তিনি বাংলা বর্ণ আর ধ্বনিকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুদ্ধস্বর আর ব্যঞ্জন। মুক্তস্বর ছ-টি—অ, আ, ই, উ, এ, ও। যে কোনো মুক্তস্বর বাংলা উচ্চারণের হ্রস্ব হতে পারে, দীর্ঘও হতে পারে। অন্য স্বরের সহায়তা ছাড়াই এদের উচ্চারণ সম্ভব।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বর্ণকে ভাগ করেছেন ২টি শ্রেণিতে— স্বর আর ব্যঞ্জন, স্বরের দুটি ভাগ—মৌলিক আর যৌগিক। অমূল্যধনের বিচারে 'বর্ণ' হচ্ছে 'লিখিত হরফ'। বর্ণকে বা ধ্বনিকে তিনি অবশ্য পরোক্ষে স্বর আর ব্যঞ্জনেই ভাগ করেছেন। স্বরধ্বনি তার কাছে দুটি জাতিতে বিভক্ত—মৌলিক আর যৌগিক। অ, আ, ই, উ, অ্যা, এ, ও,—এই ৭টি মৌলিক স্বর, ওই ,আই, আও ইত্যাদি যৌগিক স্বর। বাংলা কবিতায় কবি ব্যবহার করেন ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, পাঠক উচ্চারণ করেন ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি।

১০.৩.২ অক্ষর, দল

আমাদের এক একটা ধ্বনির উচ্চারণ বাগ্‌যন্ত্রের নানা অংশের মিলিত চেষ্টার ফল। এক এক বারের চেষ্টায় যে-কটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, ইংরেজিতে তার নাম Syllable, বাংলায় একে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন দল, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন অক্ষর।

প্রবোধচন্দ্র Syllable-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অক্ষর' কথাটির বদলে 'দল' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে দল হচ্ছে 'বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড'। 'দল' 'ছন্দ' আর 'ছান্দসিক' শব্দ তিনটি ভেঙে তিনি দেখালেন ১টি (দল্), ২টি (ছন্-দ) আর ৩টি (ছান্-দ-সিক্) দল। প্রতিটি দলে থাকবে একটিমাত্র স্বরধ্বনি (মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক), ব্যঞ্জন থাক বা না-থাক। যেসব দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর, তার নাম **মুক্তদল**; আর, যে দলের শেষে রুদ্ধস্বর (বৈ=ব্-ঐ, গৌ=গ্-ঔ, সাই=স্-আই) বা ব্যঞ্জনধ্বনি (অ-গ্, আ-ল্, ই-ন্), তার নাম **রুদ্ধদল**।

অমূল্যধনের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি এই রকম: 'বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর।' একটি শব্দ ভাঙলে তা থেকে পাওয়া যাবে কয়েকটি অক্ষর। অমূল্যধন শ্রেণিদুটির নাম দিলেন 'স্বরান্ত' (শেষে স্বরধ্বনি আছে বলে) আর 'হলন্ত' (শেষে যার ব্যঞ্জনধ্বনি)।

অমূল্যধনের 'অক্ষর' আর প্রবোধচন্দ্রের 'দল' একই। অমূল্যধনের 'স্বরান্ত অক্ষর'-ই প্রবোধচন্দ্রের 'মুক্তদল', আর অমূল্যধনের 'হলন্ত অক্ষর' প্রবোধচন্দ্রের ভাষায় 'রুদ্ধদল'।

বাংলায় মুক্ত ও রুদ্ধদলের নিত্য দীর্ঘদল ও নিত্য হ্রস্ব দল নেই। কবিতার আবেগ ও অর্থনিয়ন্ত্রিত উচ্চারণে হ্রস্বদল কোনো কোনো সময়ে দীর্ঘদলরূপে উচ্চারিত হতে পারে। তবে সেটা তার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়।

১০.৩.৩ মাত্রা, কলা

প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে—'মাত্রা' মানে আদর্শ মান। অর্থাৎ যে স্বল্পায়তন বস্তুর আনুপাতিক সংখ্যা গণনা করে কোনো বৃহত্তর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাকে বলা হয় 'মাত্রা'। ব্যাখ্যা করে আরও বলেছেন মাত্রা মানে পরিমাপক বা পরিমাণ-নির্ণায়ক। তবে ছন্দের 'বন্ধ' বা 'রীতি' ভেদে তার মাত্রাও হয় ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, পঙ্‌ক্তির মাত্রা পদ, পদের মাত্রা পর্ব। যেমন, দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি, ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি, চৌপদী পঙ্‌ক্তি; দ্বিপর্বিক পদ, ত্রিপর্বিক পদ ইত্যাদি। আবার কখনো পর্বের মাত্রা 'দল', কখনো বা 'কলা'। এ কারণে এই দুই রকম মাত্রাকে বলা হয় 'দলমাত্রা' বা 'কলামাত্রা'। অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কালপরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনিপরিমাণ। প্রবোধচন্দ্র স্পষ্ট করে বলেছেন 'ছন্দের কারবার ধ্বনিপরিমাণ নিয়ে, কালপরিমাণ নিয়ে নয়।'

মুক্তদলের উচ্চারণ সাধারণত কাটা-কাটা, আর রুদ্ধদলের উচ্চারণ কেটে কেটেও হয়, টেনে টেনেও হয়। এ কথার অর্থ— মুক্তদল সাধারণ ১-মাত্রার, আর রুদ্ধদল ১-মাত্রার বা ২-মাত্রার। কোন্ অক্ষরে বা দলে কত মাত্রা, এ নিয়ে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের কার্যত কোনও বিরোধ নেই।

দল হ্রস্ব হয় তখনই, যখন তার ভেতরকার ধ্বনি একটুখানি কুঁচকে যায়। আর দলের দীর্ঘ হওয়ার অর্থ ধ্বনিগুলির আয়তনে বেড়ে যাওয়া। এইরকম একটি কোঁচকানো বা হ্রস্ব দলের সমপরিমাণ ধ্বনির নাম প্রবোধচন্দ্র দিয়েছেন **কলা**। অর্থাৎ একটি হ্রস্বদলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, একটি দীর্ঘদলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, মাত্রার আর কলার সম্পর্কটা দাঁড়াল এই রকম প্রতিটি হ্রস্ব দলে থাকে প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ১-কলা, অমূল্যধনের হিসেবে ১-মাত্রা; প্রতি দীর্ঘ এঁদের হিসেবে ২-কলা বা ২-মাত্রা। অর্থাৎ, মাত্রা আর কলা কার্যত একই দলের, মাত্রা সংখ্যার বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করেই বাংলায় তিন শ্রেণির ছন্দোরীতি গড়ে উঠেছে। মূলত রুদ্ধদলের বিচিত্রতাই সেখানে প্রধান। মুক্তদল ও রুদ্ধদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ দলবৃত্ত ছন্দোরীতিতে রক্ষিত বলেই এখানে মুক্তদল ও রুদ্ধদলের মান ১ মাত্রার। কলাবৃত্ত রীতির সমস্ত রুদ্ধদল এবং মিশ্রবৃত্ত রীতির শব্দান্তিক রুদ্ধদল আমাদের উচ্চারণে প্রসারিত হয়ে যায় ফলে রুদ্ধদলগুলি প্রলম্বিত হয়ে ওঠে এবং তাদের মাত্রা সংখ্যা হয়ে যায় ২। অন্যদিকে সমস্ত মুক্ত দলই সংশ্লিষ্ট এবং স্বাভাবিক। তার মাত্রা '১'। দলবৃত্ত রীতির রুদ্ধদলে যেমন, তেমনই মিশ্রবৃত্ত রীতির শব্দের শুরুতে এবং শব্দমধ্যের রুদ্ধদলে।

মোট কথা দল ও মাত্রার সম্পর্কের নিরিখেই বাংলা ছন্দের তিনটি রীতি গড়ে উঠেছে। মূলত রুদ্ধদলের সংকোচন ও প্রসারণেই দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত নামের তিনধরনের ছন্দোরীতি নির্মিত হয়েছে বাংলা কবিতায়। একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যায়।

ছন্দোরীতি	**মুক্তদলের মাত্রা**	**রুদ্ধদলের মাত্রা**	
দলবৃত্ত	১	১	
কলাবৃত্ত	১	২	
মিশ্রবৃত্ত	১	১ শব্দের প্রারম্ভে ও শব্দ মধ্যে	২ শব্দান্তে

১. **দলবৃত্ত রীতিতে—**

১১ ১ ১ ১ ১১ । ১১১ ১১ ১১
মরি কার পরশমণি। গগনে ফলায় সোনা; ৭+৭
১১১১১ ১১ । ১১১ ১১১ ১
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি। অজানার আনাগোনায়।.... ৭+৭
১১১ ১১১১ । ১১১ ১১ ১১
অলকার রত্নাগারে। ঢুকেছি হঠাৎ যেন, ৭+৭

১১ ১ ১ ১ ১ ১ । ১১১ ১১ ১১
ডুবে যাই চমৎকারে। সায়রে শিশির হেন। ৭+৭

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, সাঁঝাই

২. **কলাবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্ব।**

২ ১ ১ ১ ২ । ১ ২ ১১ ১১ ।। ১ ২ ১১১১ । ১১
মন্ত্রে সে যে পূত। রাখীর রাঙা সুতো,।। বাঁধন দিয়েছিনু। হাতে, ৭+৭। ৭+২
২ ১ ১১ ১১।১১
আজ কি আছে সেটি। সাথে?.... ৭+২
২ ১ ১১১১ । ১ ২ ১১ ১১
পথ যে কতখানি। কিছুই নাহি জানি,।। ৭+৭
১ ২ ১১ ২। ১১ ২১১ ২। ১১
মাঠের গেছে কোন । শেষে চৈত্র-ফসলের। দেশে। ৭+৭+২

—উৎসর্গ-৪০

সাত মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’ কাব্য রচনাকালে।

৩। **মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্ব** (৭+৭। ৭+২)

১১১ ১১২ । ১ ২ ১১ ২ ১ ২ ।। ১ ১ ১১।১১
আনন্দে ত্রিনয়ন। সহিত দেবগণ। পূজেন নানা আয়ো-জনে।
১১১ ১১ ২ । ১১১ ১১ ২ ।। ১ ২ ১১ ১১ । ১১
সুধন্য চৈত্র মাস। অষ্টমী সুপ্রকাশ ।। বিশদ পক্ষ শুভ। ক্ষণে।।...
১ ২ ১১ ২ । ১১১ ১১ ২ ।। ১১ ১ ১১১১। ১১
দেউল-বেদীপর। প্রতিমা মনোহর।। তাহাতে অধিষ্ঠিত। মাতা।
১১১ ১১ ২। ১ ২ ১১ ২ ।। ১১ ১ ১১১ ১ ১১
সর্বতোভদ্র নাম। মণ্ডল চিত্র-নাম। লিখিলা আপনি বি : ধাতা।।

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, শিবের অন্নদা-পূজা

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে শেষ লঘুযতি লুপ্ত হয়েছে।

১০.৩.৪ যতি, ছেদ

গদ্য বা পদ্য আমাদের মুখে অ-বিরাম গতিতে উচ্চারিত হয় না। অর্থবোধ সুপরিস্ফুট করার কারণে বা সুপরিমিত গতির কারণে বিরাম প্রয়োজন হয় পড়ে। এই বিরাম বা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে থামাটাই

কারোর কাছে ছেদ, কারোর কাছে যতি। পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে নিয়মিত থামা— এর নাম **যতি।** গদ্য-পদ্যভেদে যতিনামেরও প্রভেদ ঘটে। গদ্যের যতিচিহ্নগুলির নাম কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি ইত্যাদি। গদ্যের যতি হয় প্রধানত ভাবগত এবং কিছুটা উচ্চারণসৌকর্যজাত। আর, গদ্যের যতিচিহ্ন স্থাপনের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। অন্যদিকে, পদ্যরচনার মূল উদ্দেশ্য ধ্বনির শ্রুতিমাধুর্য এবং গতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। অমূল্যধন এই বিরামকে বলেছেন ছেদ। তিনি ২-রকম যতির কথা বলেছেন—কম থামার নাম অর্ধযতি, পুরো থামার নাম পূর্ণযতি। অর্ধযতির চিহ্ন (।), পূর্ণযতির চিহ্ন (।।)।

প্রবোধচন্দ্র শুনিয়েছেন ৫-রকম যতির নাম— অণুযতি, উপযতি, লঘুযতি, অর্ধযতি, পূর্ণযতি। এই পাঁচ প্রকার যতি দ্বারা বিভক্ত পদ্যাংশের পাঁচ প্রকার নাম—দল বা কলা, উপপর্ব, পর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি। এ কারণে তিনি এই পাঁচ প্রকার যতিকে দলযতি, উপপর্বযতি, পর্বযতি, পদযতি, পঙ্‌ক্তিযতি নামে অভিহিত করেছেন। একটু তলিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, যে-কোনো বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দও আমাদের মুখে স্বভাবতঃই টুকরো-টুকরো হয়ে উচ্চারিত হয়। কোনো-কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় এক টুকরো রূপেই যেমন— না, কি, সে, মাস, দিন, ফুল। আবার কোনো কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় দুই বা ততোধিক টুকরো হয়ে। যেমন—ন.দী, সুপ্.তি, আ.কাশ, ক.বি.তা, ব.সন্.ত ইত্যাদি। আমাদের মুখে এ-রকম প্রত্যেকটি টুকরো বা খণ্ডের পরেই একটু বিরতি ঘটে, বাক্যগত এ-রকম ধ্বনিখণ্ডের পরবর্তী ক্ষণিক বিরতিকে ছন্দ-পরিভাষায় বলি অণুযতি। আর এ-রকম ধ্বনিখণ্ডকে বলি **দল** (Syllable)।

যতিগুলিকে চিহ্ন দিয়ে চিনে নেওয়া যাক। দলযতি বা অণুযতির চিহ্ন দেওয়া হয় না। তবে বুঝে নেওয়ার সুবিধার জন্য একবিন্দু দিয়ে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

২ ১ ১ ২ । ২ ১ ১ ১ ১ ।। ১১ ১ ১ ১ ১। ১ ১
চন্. দ্র য.খন্ । অস্.তে না.মি.ল ।। ত.খ.নো র.য়ে.ছে। রা.তি I ৬।৬। ৬।২ I
২১ ১ ২ ।১ ২ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১ ২ ১। ১ ১
পূর্.ব দি.কের্। অ.লস্ ন.য়.নে ।। মে.লি.ছে রক্.ত। ভা.তি I ৬৬। ৬।২ I

এটি কলাবৃত্ত ছন্দোরীতির উদাহরণ।

বিভিন্ন যতিচিহ্ন—

উপযতি বা উপপর্বযতির চিহ্ন ':'। যদিও ছন্দোলিপি করার সময় এই চিহ্ন দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। লঘুযতি বা পর্বযতির চিহ্ন '।', অর্ধযতি বা পদতির চিহ্ন '।', পূর্ণযতি বা পঙ্‌ক্তিযতির চিহ্ন I'। উপরের উদাহরণে বাকি তিন রকম চিহ্ন পাওয়া যাবে। উপরের উদাহরণটি কলাবৃত্ত ছন্দের। এ বিষয়ে আমরা বিশদে আলোচনা পরে করা হবে।

বাংলা ছন্দে বিভিন্ন যতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম

অণুযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**দল / কলা**
উপযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**উপপর্ব**
লঘুযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**পর্ব**
অর্ধযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**পদ**
পূর্ণযতি দ্বারা বিভক্ত অংশনাম	—	**পঙ্ক্তি**

বাংলা ছন্দে বিভিন্ন অংশ সংযুক্তি ও গঠন

দল + দল = উপপর্ব
উপপর্ব + উপপর্ব = পর্ব
পর্ব + পর্ব = পদ
পদ + পদ = পঙ্ক্তি
পঙ্ক্তি + পঙ্ক্তি = স্তবক

১০.৩.৫ পর্ব, অতিপর্ব

প্রবোধচন্দ্র বলেছেন 'লঘুযতির দ্বারা খণ্ডিত পদ-বিভাগের পারিভাষিক নাম 'পর্ব। দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতিতে পর্ববিভাগ বোঝা যায়। কিন্তু মিশ্রবৃত্ত রীতিতে লঘুযতি বা পর্ববিভাগ অনেক সময় স্পষ্ট থাকে না। এতে অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ দিই—

১. মুদিত আলোর। কমল-কলিকা। -টিরে ৬+৬+২
রেখেছে সন্ধ্যা। আঁধার-পর্ণ। -পুটে। I ৬+৬+২
উতরিবে যবে। নব প্রভাতের। তীরে ৬+৬+২
তরুণ কমল। আপনি উঠিবে। ফুটে। I ৬+৬+২

এটি কলাবৃত্ত রীতির উদাহরণ। দ্বিপদী দুটি পঙ্ক্তি।

'পর্ব' শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ। একই মাপের পর্ব পরপর ঘুরে ঘুরে এলে তার নাম 'পূর্ণপর্ব'। কবিতার ছত্রের শুরুতে, কখনো কখনো মাঝখানে ছোটো মাপের এমন পর্ব মাঝে মাঝে কবিরা ব্যবহার করেন, যা ছন্দের হিসেবের বাইরে। এ রকম অতিরিক্ত পর্বের নাম 'অতিপর্ব। প্রবোধচন্দ্র এর সংজ্ঞা হিসেবে বলেছেন 'কোনো ছন্দপঙ্ক্তির পূর্বে স্থাপিত প্রস্বরহীন অথচ অর্থবহ দ্বিমাত্রক শব্দ'। অতিপর্ব বাক্যের অর্থবোধের সহায়ক। অথচ এদের আদিতে কোনো প্রস্বর থাকে না। প্রস্বর থাকে মূল ছন্দপঙ্ক্তির আদিতে। যেমন—

আমি হব না ভাই নববঙ্গে নবযুগের চালক,

আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে ব্রজের গোপবালক,
তবে চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।

—ক্ষণিকা, জন্মান্তর

দলবৃত্ত রীতিতে রচিত এই কবিতায় 'আমি', 'যদি', 'কোথাও', 'তবে' শব্দগুলি অর্থবহ দ্বিমাত্রক। এগুলি 'অতিপর্ব'।

১০.৩.৬ উপপর্ব

উপযতি দ্বারা বিভক্ত অংশের নাম উপপর্ব। অমূল্যধনের 'পর্বাঙ্গ' আর প্রবোধচন্দ্রের 'উপপর্ব' পর্বেরই এক-একটি বিভাগ। কিন্তু, পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সবসময় হুবহু এক নয়। এর কারণ, অমূল্যধনের 'পর্ব' আর প্রবোধচন্দ্রের 'পর্ব' সবসময় মাপে এক হয় না। অমূল্যধনের মতে পর্বে মাঝখানে যতি নেই, (:) চিহ্নটিও যতিচিহ্ন নয়। প্রবোধচন্দ্রের মতে যতি অবশ্যই আছে, যতিই পর্বকে উপপর্বে ভাগ করে এবং সে-যতির নাম উপযতি।

উদাহরণ দিই—

নমো : নমো : নম। সুন : দরী : মম ।। জননী : বঙ্গ।-ভূমি। ৬+৬। ৬+২ I
গঙ্ : গার : তীর। স্নিগ্ধ : সমীর ।। জীবন : জুড়ালে : তুমি। ৬+৬। ৬+২ I

: দ্বিবিন্দু চিহ্নিত উপপর্ব। কলাবৃত্তের উদাহরণ। ষন্মাত্রক দ্বিপর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্ক্তি।

১টি পর্বকে ২টি-৩টি ভাগে উচ্চারণ করে এক-একটি ভাগকে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'উপপর্ব'।

১.৩.৭ পদ

প্রবোধচন্দ্র বলেছেন 'অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত পঙ্ক্তিবিভাগের পারিভাষিক নাম '**পদ**'। পদবদ্ধ রচনার নামই পদ্য। পদের বিভাগ — একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী। পর্বের উপাদান মাত্রা (দলমাত্রা বা কলামাত্রা) আর মাত্রাসংখ্যার দ্বারা নিরূপিত হয় পর্বের রূপ, অর্থাৎ পদের আয়তনগত আকৃতি।

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত, এই তিন রীতিতেই পদ গঠিত হয়, সাধারণত দুই ও তিন পর্ব নিয়ে। পদের শেষ পর্ব অনেক সময় অপূর্ণ থাকে। এই অপূর্ণতার দ্বারাও পদের তথা পঙ্ক্তির রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

একপদী পঙ্ক্তি:

যে ছন্দপঙ্ক্তি কোনো অর্ধযতির দ্বারা বিভক্ত নয়, তাকে বলা হয় একপদী। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার একপদী পঙ্ক্তির দৃষ্টান্ত শ্রেণিবদ্ধ রূপে সাজিয়ে দেওয়া গেল।

এক। চতুর্মাত্রক পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃত্ত একপদী—এক পর্বের পদ:

গগন-তলে	দুধের চাছি।
আগুন জ্বলে।.....	শুষছে মাছি।...
ময়রা মুদি	কুকুর গুলো
চক্ষু মুদি	শুকছে ধুলো,
পাটায় বসে	ধুঁকছে কেহ
ঢুলছে ক'সে	ক্লান্ত দেহ।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'কুহু ও কেকা', পালকীর গান

২। কলাবৃত্ত একপদী—এক পর্বের পদ

যত কয়।	কোথা রাখি।
তত নয়।	তোতাপাখি।।
শিখি নাই	খৈ চাই
লিখি তাই।	দৈ চাই।

—মদনমোহন, শিশুশিক্ষা (প্রথম ভাগ)

(B) দ্বিপদী পঙক্তি :

এবার আমরা তিন রীতিতে দ্বিপদী ছন্দের উদাহরণ দেখে নেব।

১। দলবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী — ৪+৪। ৪+৪ মাত্রা

তোমার মাপে। হয়নি সবাই ।। তুমিও হওনি। সবার মাপে,
তুমি মরো। কারও ঠেলায়,। কেউ বা মরে। তোমার চাপে।

উদাহরণটিতে 'তুমিও' শব্দের -মিও সঙ্কুচিত হয়ে একমাত্রা পেয়েছে।

২। কলাবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী — ৪+৪। ৪+৪ মাত্রা

চম্পক। তরু মোরে ।। প্রিয়সখা। জানে সে-,
গন্ধের। ইঙ্গিতে ।। কাছে তাই। টানে যে-।

উদাহরণটিতে 'সে' এবং 'যে' শব্দদুটি প্রসারিত হয়ে দুইমাত্রা পেয়েছে।

৩। মিশ্রবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী — ৪+৪। ৪+৪ মাত্রা

এখন বিঃশ্বের তুমি, ।। গুন্‌গুন্ । মধুকর
চারি দিকে। তুলিয়াছে।। বিস্ময়-ব্যা:কুল স্বর।

উদাহরণটিতে 'বিশ্বের' এবং ব্যাকুল' শব্দদুটিতে পর্বযতি অনাঘাতি।

ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি:

যে ছন্দপঙ্‌ক্তি দুই অধতির দ্বারা তিন ভাগে (অর্থাৎ তিন পদে) বিভক্ত, তাকে বলা হয় ত্রিপদী। ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির। তিন পদ সাধারণত সমায়তন হয় না।

১. দলবৃত্ত ত্রিপদী — ৪ + ৪। ৪ + ৪। ৪ + ২ মাত্রা

কে গো চিরজন্ম ভরে
নিয়েছে মোর হৃদয় হরে,
উঠছে মনে জেগে।
নিত্যকালের চেনাশোনা
করছে আজি আনাগোনা
নবীন-ঘন মেঘে।

—**'উৎসর্গ-৩৩', 'দেখো চেয়ে গিরির শিরে'**

২। কলাবৃত্ত ত্রিপদী — ৪ + ৪। ৪ + ৪। ৪ + ২ মাত্রা

অঘ্রান হল সারা,
স্বচ্ছ নদীর ধারা
বহি চলে কলসংগীতে।
কম্পিত ডালে ডালে
মর্মর তালে তালে
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে।

—**'চিত্রবিচিত্র', শীত**

৩। মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী — ৪ + ৪। ৪ + ২ মাত্রা

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা,
সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা।
দিনের কল্লোল 'পর
টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।

—**'কল্পনা', অশেষ**

তিন দৃষ্টান্তেই পঙ্‌ক্তিগুলি দুটি অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে বা পদে বিভক্ত। দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত পঙ্‌ক্তির তিন পদে আছে যথাক্রমে আট-আট-ছয় মাত্রা।

দলবৃত্তের চৌপদী পদ

দুয়ার জুড়ে। কাঙাল-বেশে।।	(পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৮)
ছায়ার মতো। চরণ-দেশে।।	(পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৮)
কঠিন তব। নূপুর ঘেঁষে।।	(পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৮)
আর বসে না। রইব। I	(পর্বমাত্রা ৪, পদমাত্রা ৬)

—**'ক্ষণিকা', বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ**

এর প্রথম পঙ্‌ক্তি চৌপদী। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী।

২। কলাবৃত্ত চৌপদী—৮ + ৮ + ৮ + ৫ ও ৭ পদমাত্রা

ক. পথপাশে মল্লিকা। দাঁড়াল আসি,	৮+৫ (দুটি পদ)
বাতাসে সুগন্ধের। বাজাল বাঁশি। I	৮+৫ (দুটি পদ)
ধরার স্বয়ম্বরে।	৭
উদার আড়ম্বরে।	৭
আসে বর অম্বরে।	৮
ছড়ায়ে হাসি। I	৫

—'মহুয়া', বরযাত্রা

১০.৩.৮ পঙ্‌ক্তি

পুরো থামার যতিকে বলা হয় পূর্ণযতি', এক পূর্ণযতি থেকে আর এক পূর্ণযতি পর্যন্ত পুরো ছত্রটির নাম অমূল্যধনের কাছে **চরণ**, প্রবোধচন্দ্রের কাছে **পঙ্‌ক্তি।** বলা প্রয়োজন যে, ছন্দের **পঙ্‌ক্তি (verse** বা **metrical line**) আর মুদ্রিত বা লিখিত **ছত্র** (printed বা written line) এক নয়। একই ছন্দপঙ্‌ক্তিকে অভিরুচি বা প্রয়োজনমতো একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা যায় বা লিখতে হয়। এসব ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তিগুলিকে সাধারণত অর্ধযতিতে বিভক্ত করে দুই বা ততোধিক ছত্রে সাজানো হয়। কখনও কখনও লঘুযতি অনুসারেও ছত্রভাগ করা যায়। কিন্তু যথেচ্ছ ভাগ করা কখনও চলে না। ছন্দপঙ্‌ক্তি অর্ধযতি বা লঘুযতি অনুসারে একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা হয়ে আর চিহ্ন দিয়ে যতিবিভাগ দেখাবার প্রয়োজন থাকে না। অর্ধযতি বা লঘুযতি চিহ্ন তখন উহ্য থাকে।

১০.৩.৯ স্তবক, শ্লোক

কবিতা যখন পড়ি, তখন আমরা পর পর নির্দিষ্ট মাপের (মাত্রা সংখ্যার) পঙ্‌ক্তিই একের পর এক উচ্চারণ করে যেতে থাকি। একটি কবিতার গোটা শরীরে যতগুলি পঙ্‌ক্তি ছড়ানো আছে, তাদের ছন্দ-স্বভাব একটাই। সে-কারণে, কোনও কবিতার ছন্দ বোঝার জন্য গোটা কবিতাই পড়ে পড়ে দেখার প্রয়োজন নেই, কবিতার একটি অংশ এর জন্য বেছে নিলেই চলে। তবে, অংশটি এমন হওয়া চাই, যাতে

থাকে মাপ বা মাত্রা সংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা পরপর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। এই রকম কয়েকটি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে ছান্দসিকেরা বলেন স্তবক।

১০.৩.১০ মিল

বাংলা ছন্দের আলোচনায় মিল-এর বিশেষ করে অন্ত্যমিলের গুরুত্ব ছান্দসিকেরা স্বীকার করে থাকেন। মিল হচ্ছে আসলে স্তবকের মাঝখানে একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থানে ফিরে ফিরে আসা। একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি দুটি পর্বের শেষে হতে পারে, দুটি পদের শেষে হতে পারে, দুটি পঙ্‌ক্তি বা চরণের শেষেও হতে পারে। পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তি-চরণ যার শেষেই হোক, মিলটা শেষে থাকে তার চলতি নাম অন্ত্যমিল—পর্বান্ত্য পঙ্‌ক্তি-অন্তক চরণান্ত্য মিল। একই স্তবকের মাঝখানে পৃথক পৃথক পর্ব চরণ পদ বা পঙ্‌ক্তির শেষে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের ফিরে ফিরে আসাকে বলে মিল। যেমন—

টালায় প্রকাশ নামে থাকে এক ডাক্তার
ভারি তার হাতযশ, ভারি নাম ডাক তার।
মাঠ দিয়ে হন হন চড়ে যায় পালকি
ও গ্রামের জমিদার নটবর পাল কি?

১০.৩.১১ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর

পর্বের মাঝখানে কোনো অক্ষরের (দলের) স্বরধ্বনি অন্য অক্ষরের তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলে সেই অক্ষরের ওপর যে বাড়তি ঝোঁক পড়ে, তাকে অমূল্যধন বলেন 'শ্বাসাঘাত। বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকে পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদলের) ওপর, হলন্ত অক্ষর না-থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর 'শ্বাসাঘাত' পড়ে। প্রবোধচন্দ্রের মতে, যে কোনো কবিতার স্তবকে প্রতি পর্বের প্রথম দলের ওপর যে তীব্র ঝোঁক পড়ে, তার নাম 'প্রস্বর'।

১০.৪ সারাংশ

বর্ণ, ধ্বনি— আমরা যা উচ্চারণ করি, তার লিখিত চিহ্নের নাম হরফ বা বর্ণ। বর্ণের উচ্চারিত রূপটিই ধ্বনি। ছান্দসিকের ভাষায় বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ। **অক্ষর, দল**— প্রবোধচন্দ্র সিলেবল্-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অক্ষর' কথাটির বদলে 'দল' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে দল হচ্ছে 'বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড'। যেসব দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর, তার নাম মুক্তদল; আর, যে দলের শেষে রুদ্ধস্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনি তার নাম রুদ্ধদল। **মাত্রা, কলা**—প্রবোধচন্দ্র

সেন বলেছেন— 'মাত্রা' মানে আদর্শ মান। অর্থাৎ যে স্বল্পায়তন বস্তুর আনুপাতিক সংখ্যা গণনা করে কোনো বৃহত্তর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাকে বলা হয় 'মাত্রা'। প্রবোধচন্দ্র 'ছন্দের কারবার ধ্বনিপরিমাণ নিয়ে, কালপরিমাণ নিয়ে নয়।' **যতি, ছেদ**—পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে নিয়মিত থামা—এর নাম যতি। পদ্যরচনার মূল উদ্দেশ্য ধ্বনির শ্রুতিমাধুর্য এবং গতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। প্রবোধচন্দ্র শুনিয়েছেন ৫-রকম যতির নামঅণুযতি, উপযতি, লঘুযতি, অর্ধযতি, পূর্ণযতি। তিনি এই পাঁচ প্রকার যতিকে দলতি, উপপর্বযতি, পর্বযতি, পদযতি, পঙ্‌ক্তিযতি নামে অভিহিত করেছেন। **পর্ব, অতিপর্ব**—প্রবোধচন্দ্র বলেছেন 'লঘুযতির দ্বারা খণ্ডিত পদ-বিভাগের পারিভাষিক নাম 'পর্ব'। 'পর্ব' শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ। **উপপর্ব**—উপযতি দ্বারা বিভক্ত অংশের নাম উপপর্ব। অমূল্যধনের 'পর্বাঙ্গ' আর প্রবোধচন্দ্রের 'উপপর্ব' পর্বেরই এক-একটি বিভাগ। **পদ**—প্রবোধচন্দ্র বলেছেন 'অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত পঙ্‌ক্তিবিভাগের পারিভাষিক নাম 'পদ'। **পঙ্‌ক্তি**—পুরো থামার যতিকে বলা হয় পূর্ণযতি', এক পূর্ণযতি থেকে আর এক পূর্ণযতি পর্যন্ত পুরো ছত্রটির নাম পঙ্‌ক্তি। **স্তবক, শ্লোক**—কয়েকটি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে ছান্দসিকেরা বলেন স্তবক। সাধারণভাবে 'স্তবকে'র অন্তর্গত চরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়—২ থেকে ৮ পর্যন্ত, এমনকি তার চেয়েও বেশি হতে পারে। **সংশ্লেষ, বিশ্লেষ**—'সংশ্লেষ' এর অর্থ রুদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, আর বিশ্লেষ'-এর অর্থ রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ। **শ্বাসাঘাত, প্রস্বর**—অমূল্যধনের মতে, পর্বের অন্তর্গত কোনো অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ অন্য অক্ষরের স্বরধ্বনির তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলেই ঐ অক্ষরের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়ে। এরকম ঝোঁকের নাম তিনি দিলেন শ্বাসাঘাত। প্রবোধচন্দ্রও দলের উচ্চারণে ঝোঁকের কথা মানেন। তবে তাঁর বিচারে সে-ঝোঁক তীব্র হয়ে পড়ে কেবল পর্বের প্রথম দলে। এই ঝোঁকের নাম প্রস্বর। **মিল**—মিল হচ্ছে আসলে স্তবকের মাঝখানে একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পৃথক পৃথক অবস্থানে ফিরে ফিরে আসা। পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তি-চরণ যার শেষেই হোক, মিলটা শেষে থাকে তার চলতি নাম অন্ত্যমিল—পর্বান্ত্য পঙ্‌ক্তি-অন্তক চরণান্ত্য মিল।

১.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১. উদাহরণসহ কাকে বলে, লিখুন —
   দল, মাত্রা, পর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি, স্তবক।
২. 'দল' কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. চতুর্মাত্রক ও পঞ্চমাত্রক পর্বের একটি করে উদাহরণ দিন।
৪. দ্বিপদী ও ত্রিপদী পদের একটি করে উদাহরণ দিন।
৫. অতিপর্ব কাকে বলে। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৬. পর্ব আর পদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ব্যাখ্যা করুন।
৭. 'চরণ' ও 'পঙ্‌ক্তি' এ দুয়ের সম্পর্কটি বুঝিয়ে বলুন।
৮. 'শ্বাসাঘাত' ও 'প্রস্বর' পৃথক নামকরণের কারণ কী?
৯. 'মিল' বলতে কাকে বোঝানো হয়? উদাহরণ দিয়ে দেখান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

১. শ্বাসাঘাত কাকে বলে উদাহরণ দাও।
২. অক্ষর কী?
৩. মিশ্রকলাবৃত্তের দল বিভাজনটি লেখ।
৪. যতি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৫. উপপর্ব কী? তার বিভাগগুলি সংক্ষেপে লেখ।
৬. পঙ্‌ক্তি কাকে বলে লেখ।
৭. কলা কী? উদাহরণ দাও।
৮. অতিপর্বের গঠন আলোচনা কর।
৯. ছন্দে পদ বলতে কী বোঝায় লেখ।
১০. ছেদ-এর গঠন আলোচনা কর।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. নূতন ছন্দ-পরিক্রমা— প্রবোধচন্দ্র সেন।
২. বাংলা ছন্দের মূল সূত্র— অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।
৩. আধুনিক বাংলা ছন্দ— নীলরতন সেন।
৪. বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা— নীলরতন সেন।
৫. ছন্দ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একক ১১ : বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

একক গঠন:

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ মূলপাঠ : বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

- **১১.৩.১ ছন্দের ত্রিরীতির নামান্তর**
- **১১.৩.২ দলবৃত্ত / শ্বাসাঘাতপ্রধান**
- **১১.৩.৩ কলাবৃত্ত / ধ্বনিপ্রধান**
- **১১.৩.৪ মিশ্রবৃত্ত / তানপ্রধান**

১১.৪ বৈষ্ণব পদাবলির ছন্দ

১১.৫ সারাংশ

১১.৬ অনুশীলনী

১১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

পূর্বের এককে দেওয়া হয়েছে বাংলা ছন্দের পারিভাষিক পরিচয়। ফলে ছন্দের বারান্দায় চলাচলে আপনারা যে কিছুটা সহজ হয়েছেন, তা অনুমান করা যেতে পারে। এবারে আমরা প্রবেশ করব ছন্দের মূল আলোচ্য বিষয়ে। দেখে নেব ছন্দের রীতি-পদ্ধতির ভাগ এবং সেসব রীতির নামান্তর। উদাহরণসহ রীতিগুলির পরিচয় দেওয়া হবে।

১১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ছন্দের মূল তিনটি রীতি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। প্রত্যেক অগ্রগণ্য ছান্দসিক বা ভাষাতাত্ত্বিক তিনটি রীতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। গোল বেধেছে অন্যত্র। এই তিন রীতিকে কী নামে ডাকা হবে, কোন নামে ওই রীতিগুলির প্রতি সুবিচার করা হবে, তা নিয়ে মতান্তর আছে। যাঁরা ছন্দরসিক, তাঁরা যথার্থ নাম নিয়ে চিন্তিত নন। তাঁরা চলনটি চেনেন। সমস্যাটা দাঁড়ায় শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। এত মতের অরণ্যে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হন।

বাংলা ছন্দ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া আছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও আরও অনেকে। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং মত অনুসারে তিনটি রীতির নামকরণ

করেছিলেন। এরপর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২) অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে ছন্দ চেনার কলাকৌশল, রীতিনীতি এবং পারিভাষিক শব্দসম্ভার হাজির করলেন। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হল। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে তাঁর সংজ্ঞা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গৃহীত হল। দীর্ঘদিন শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দ নিয়ে গভীর অভিনিবেশের পরিচয় ধারাবাহিকভাবে দিয়ে চলছিলেন বহু গ্রন্থে। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তার ছন্দ-সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যা এগারোটি। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ছন্দ সোপান' (১৯৮০) এবং 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' (১৯৮৬)। শেষের বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়। এই বইটিতে তিনি অমূল্যধনের সংজ্ঞা-বিচার-বিশ্লেষণের ত্রুটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুযায়ী তুলে ধরেন। সবচেয়ে গুরুত্ব পায় নামকরণ প্রসঙ্গটি।

কারণ নামকরণের ওপরেই বাংলা ছন্দরীতির গভীর তাৎপর্যটি লুকিয়ে আছে। প্রথম পর্যায়ে তিনি ত্রিরীতির যে নামকরণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে নিজেই তাকে সংশোধন করেন।

১১.৩ মূলপাঠ: বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

১১.৩.১ বাংলা ছন্দের ত্রিরীতির নামান্তর

দলবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)	কলাবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)	মিশ্রবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)
।	।	।
স্বরবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)	মাত্রাবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)	অক্ষরবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)
।	।	।
শ্বাসাঘাতপ্রধান (অমূল্যধন)	ধ্বনিপ্রধান (অমূল্যধন)	তানপ্রধান (অমূল্যধন)
।	।	।
প্রাকৃত (রবীন্দ্রনাথ)	সাধু (রবীন্দ্রনাথ)	সাধু (রবীন্দ্রনাথ)
।	।	।
মাত্রিক (দ্বিজেন্দ্রলাল)	মিতাক্ষর, নূতন (দ্বিজেন্দ্রলাল)	মিতাক্ষর, পুরাতন (দ্বিজেন্দ্রলাল)
।	।	।
চিত্রা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)	হৃদ্যা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)	আদ্যা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)
।	।	।
স্বরবৃত্ত (সুনীতিকুমার)	মাত্রাবৃত্ত (সুনীতিকুমার)	অক্ষরবৃত্ত (সুনীতিকুমার)
।	।	।
পাদকমাত্রিক (কালিদাস রায়)	স্বরমাত্রিক (কালিদাস রায়)	অক্ষরমাত্রিক (কালিদাস রায়)

১১.৩.২ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি

দলবৃত্ত আর শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি একই ছন্দরীতির দুটি নাম। এ-রীতির ছন্দে প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার সে-দল মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক। অর্থাৎ, দলই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম প্রবোধচন্দ্র রাখেন দলবৃত্ত। আবার অমূল্যধন লক্ষ করলেন, এ-রীতিতে প্রতিটি পর্বে অন্ততপক্ষে ১টি করে শ্বাসাঘাত পড়ে-ই। অতএব, এর নাম হল শ্বাসাঘাতপ্রধান। এ রীতির প্রতিটি দলের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ১-মাত্রা, পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অমূল্যধনের বিবেচনায় এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদল) ওপর, হলন্ত অক্ষর না থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর। যেমন—

ঠাকুরদাদার। মতো বনে ।। আছেন ঋষি। মুনি, (৪+৪। ৪+২)
তাঁদের পায়ে। প্রণাম করে ।। গল্প অনেক। শুনি। (৪+৪। ৪+২)

—**'শিশু', বনবাস।**

দলসংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে, প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চারটি করে দল, আর অপূর্ণ পর্বে দুটি করে। একটু মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে, আমাদের উচ্চারণে এই দৃষ্টান্তের রুদ্ধদলগুলি সংকুচিত হয়ে মুক্তদলের সমান হয়ে যায়। অর্থাৎ মুক্ত ও রুদ্ধ নির্বিশেষে সব দলই হয় সমান মানের। ফলে এই রীতির ছন্দে মুক্ত ও রুদ্ধ দলের কোনো ভেদ না মেনে সব দলই একমাত্রা বলে গণ্য করা হয়। হিসাব করলে দেখা যাবে, এই দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চারটি করে দল, অপূর্ণ পর্বে দুটি করে। দলসংখ্যার এই সমতার উপরেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই রীতিতে এক দলই এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাই এই রীতিকে বলা যায় **দলমাত্রক** বা **দলবৃত্ত** (syllabic) রীতি।

১১.৩.৩ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি

যে ছন্দ-রীতি প্রবোধচন্দ্রের কাছে কলাবৃত্ত, তা-ই অমূল্যধনের কাছে ধ্বনিপ্রধান। প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া হিসেব থেকে জেনেছি —১-মাত্রার প্রতিটি দল হ্রস্ব এবং তার ধ্বনি পরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ, তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। এখন যে ছন্দ রীতির আলোচনা করছি, সেখানে প্রতিটি মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা এবং মাত্রাও ১টি; প্রতিটি রুদ্ধদল দীর্ঘ, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা এবং মাত্রা ২টি। অর্থাৎ 'কলা'-ই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম **কলাবৃত্ত।**

প্রবোধচন্দ্র বলেছেন—'কলা' একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিপরিমাণ, অতএব, 'কলাবৃত্ত' রীতিতে প্রতিটি দলের অন্তর্গত ধ্বনিপরিমাণের হিসেব নির্দিষ্ট, দলের মাত্রা-ও নির্দিষ্ট। অমূল্যধনের কথাতেও, এ-রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান। স্পষ্ট উচ্চারণে অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি ধ্বনির হিসেব এখানে রাখতে হয়। এই কারণে, স্বরান্ত অক্ষর (মুক্তদল) এই রীতিতে হ্রস্ব হলেও হলন্ত অক্ষর (রুদ্ধদল) দীর্ঘ হতে চায়। অর্থাৎ, স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা আর হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা নির্দিষ্ট। অক্ষরের ধ্বনিপরিমাণ বা ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে মাত্রা নির্দিষ্ট হয় বলেই এ রীতির নাম **ধ্বনিপ্রধান**। উদাহরণ—

ক-ল্‌লোলে। কোলাহলে। জাগে এ-ক। ধ্বনি,
অ-ন্‌ধে-র্‌। ক-ণ্‌ঠে-র। গা- ন্‌আগ। -মনী।

—**'চিত্রবিচিত্র', আগমনী**

এই দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে চার দল নেই। কিন্তু আমাদের উচ্চারণে এই দৃষ্টান্তের রুদ্ধদলগুলি প্রসারিত হয়ে মুক্তদলের দ্বিগুণ হয়ে যায়, অর্থাৎ দুটি মুক্তদলের সমান হয়। পূর্বে বলেছি একটি অনায়ত মুক্তদলের সমপরিমাণ ধ্বনির পারিভাষিক নাম কলা (mora)। প্রতি মুক্তদলে এক কলা এবং রুদ্ধদলে দুই কলা হিসাবে গণনা করলে এই দৃষ্টান্তের প্রতি পর্বে পাওয়া যাবে চার কলা অপূর্ণ পর্বে দুই কলা। কলাসংখ্যার এই সমতার উপরেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই রীতিতে এক কলাই এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাই রীতিকে বলা যায় **কলামাত্রক** বা **কলাবৃত্ত** (moric) রীতি। এ রীতির প্রতিটি মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) হ্রস্ব উচ্চারণ ১-মাত্রা, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ২-মাত্রা; পূর্ণপর্বে ৪ থেকে ৭ মাত্রা প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে, ৫ থেকে ৮ মাত্রা অমূল্যধনের হিসেবে।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিতে মুক্তদল সাধারণত হস্ব এবং ১-মাত্রার, এ কথা জানলেন। এরপর এই রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তদলের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার হতেও দেখবেন। ২ মাত্রার মুক্তদল আছে ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতায়, এবং আধুনিক কালের দু-চারটি বাংলা কবিতায়। সংস্কৃত কাব্য কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলা কবিতায়, বিশেষ করে চর্যাপদে, এবং ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এ রীতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল। এই কারণে প্রবোধচন্দ্র একে বলেন **প্রাচীন কলাবৃত্ত।** এর চলতি নাম অবশ্য 'প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্রত্নকলাবৃত্ত'।

১১.৩.৪ মিশ্রবৃত্ত রীতি বা তানপ্রধান

বাংলা ছন্দের আর-একটি রীতিরও দুটি নাম পাশাপাশি চলছে—মিশ্রবৃত্ত আর তানপ্রধান। আমরা জেনেছি, দলবৃত্ত রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদলও ১-মাত্রার। কলাবৃত্তে মুক্তদল ১-মাত্রার, কিন্তু রুদ্ধদল ২-মাত্রার। আর, আমাদের আলোচ্য রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রায় নির্দিষ্ট হলেও রুদ্ধদল কিন্তু ১-মাত্রার হতে পারে, আবার ২ মাত্রারও হতে পারে। এটা নির্ভর করে রুদ্ধদলটি শব্দের (Word) অবস্থানের ওপর। এই রীতিতে শব্দের আদি ও মধ্য রুদ্ধদল হবে ১-মাত্রার, অন্ত্য এবং একক রুদ্ধদল ২-মাত্রা হয়। আলোচ্য রীতিতে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করলেন রুদ্ধদলের দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—একটি ১-মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব, আর একটি ২-মাত্রার কলাবৃত্ত স্বভাব। এর অর্থ, এ-রীতি আসলে দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রণেই তৈরি। এই কারণে এ রীতির নাম হল মিশ্রবৃত্ত। এই শ্রেণির কবিতা পড়তে পড়তে অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে একটা টানা সুর। এই টানা সুর বা সুরের টান বা 'তান'-কেই এ ছন্দরীতির বিশেষ লক্ষণ বলে তাঁর কাছে মনে হল। সেই কারণে এ-রীতিকে তিনি বললেন **তানপ্রধান**।

অতএব, যে ছন্দরীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, আদি ও মধ্য রুদ্ধদল ১-মাত্রার, অন্ত্য এবং একক রুদ্ধদল ২-মাত্রার, তাকেই বলব মিশ্রবৃত্ত। ওই মিশ্রবৃত্তেরই অন্য নাম তানপ্রধান। রুদ্ধদলের মাত্রার

হিসেব দিয়েই প্রবোধচন্দ্র ছন্দরীতি নির্ধারণ করেন।

ভালোমন্দ। দুঃখসু-খ। অন্ধকার। আলো
মনে হ-য়,। স-ব নিয়ে। এ ধরণী। ভালো।

—**'চৈতালী', ধরাতল**

এই দৃষ্টান্তের ছন্দোরীতিও আসলে কলাবৃত্ত রীতিরই রূপান্তর মাত্র। তাতে রুদ্ধদলের অবস্থানভেদে তার উচ্চারণে ও কলাগণনায় কিছু হেরফের ঘটে। এই রীতিতে শব্দের অন্তে অবস্থিত রুদ্ধদল আমাদের উচ্চারণে প্রসারিত হয়ে দুই কলা-পরিমিত হয়। একদল শব্দের রুদ্ধদলও শব্দান্ত্য বলে গণ্য হয়। আর, শব্দের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদল সাধারণতঃ সঙ্কুচিত হয়ে এক কলা বলেই গণ্য হয়। এই হিসাবে তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'মন্দ' শব্দের মন্, 'দুঃখ' শব্দে 'দুঃ' এবং 'অন্ধকার' শব্দের অন, এই তিন দলের প্রত্যেকটি এক কলার সমান এবং 'সুখ্', 'কার্', 'হয়্', এই চার দলের প্রত্যেকটি দুই কলার সমান। আর, মুক্ত দল তো স্বভাবতই এককলা-পরিমিত। সুতরাং মুক্তদল ও শব্দের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদলে এক কলা আর শব্দান্ত্য রুদ্ধদলে দুই কলা হিসাবে গণনা করলে এই তৃতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণপর্বে চার কলা এবং অপূর্ণ পর্বে দুই কলা পাওয়া যাবে। তাতেই বোঝা যায়, এই রীতিতেও কলা-কেই ছন্দের মাত্রা বলে গণ্য করা হয়। তার মানে এই রীতিও আসলে কলাবৃত্ত। তবে তাতে রুদ্ধদলের দুই রূপের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। এই বিশিষ্টতার জন্য এই রীতির নাম হয়েছে **মিশ্র-কলাবৃত্ত,** সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত** (composite)।

৩.৪ বৈষ্ণব পদাবলির ছন্দ

প্রথমেই বলে রাখি, বৈষ্ণব পদাবলি গেয় কবিতা। গীতিকবিতা হওয়ার কারণে কবিরা প্রতি পর্বে বা পদে মাত্রাসংখ্যায় সমতা রক্ষা করেন। ফলে আমরা দেখি প্রয়োজনমতো স্থানে মুক্তদলের দৈর্ঘ্য ১ মাত্রা থেকে বেড়ে ২ মাত্রা হয়েছে। এই বৃদ্ধি তিন ধারার ছন্দেই হতে পারে। প্রাচীন এ-ধরনের রীতিটি ব্যবহৃত হয় বলে প্রাচীন দলবৃত্ত, প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মিশ্রবৃত্ত নামে একে অভিহিত করা হয়। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

উদাহরণ ১

১১১ ১১১১। ২ ১ ২ ১ ১।
গগনে অবঘন। মে-হ দারুন।
১১১ ২ ১১ ১১১১ I
সঘনে দা-মিনী চমকই I = ৭+৭+১১
১১১ ২ ১ ১। ১১১ ১১১১।
কুলিশ পা-তন। শবদ ঝনঝন।
১১১ ১১১১ ১১১১ I
পবন খরতর বলগই I = ৭+৭+১১

সংকেত-চিহ্ন: অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১, ২)

মাত্রারীতি: হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি: প্রাচীন কলাবৃত্ত। সপ্তমাত্রিক পদের ত্রিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। তৃতীয় পদ ১১ মাত্রার।

বৈশিষ্ট্য: ১. চারটি মুক্তদল দীর্ঘ হয়েছে। ২. রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর নেই।

উদাহরণ ২

২১১ ২১১। ১১১ ১ ২ ২ I
মন্‌দির বা-হির। কঠিন কপা-ট- I = ৮+৮ = ১৬
১১১১ ২১ ১। ২ ১১ ২ ২ I
চলইতে শঙ্‌কিল। পঙ্‌কিল বা-ট- I = ৮+৮ = ১৬

সংকেত-চিহ্ন: অর্ধযতি (১) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)।

মাত্রারীতি: হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা। আদি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি ও প্রাচীন কলাবৃত্ত। চতুর্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। অষ্টমাত্রিক পদ।

১১.৫ সারাংশ

বাংলা কবিতার তিনটি ছন্দরীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রবোধচন্দ্র সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পৃথক পৃথক যুক্তি দেখিয়ে তিনটি ছন্দরীতির তিনটি করে নাম সুপারিশ করেছেন। প্রবোধচন্দ্রের কাছে যে রীতি দলবৃত্ত, অমূল্যধনের কাছে তা শ্বাসাঘাতপ্রধান; প্রবোধচন্দ্রের কলাবৃত্ত-ই অমূল্যধনের ধ্বনিপ্রধান; আর, প্রবোধচন্দ্রের মিশ্রবৃত্ত অমূল্যধনের কাছে তানপ্রধান। এঁদের পদ্ধতি পৃথক, সিদ্ধান্ত কখনো কখনো এক।

প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া হিসেব থেকে জেনেছি — ১-মাত্রার প্রতিটি দল হ্রস্ব এবং তার ধ্বনি পরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ, তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। যেখানে প্রতিটি মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা এবং মাত্রাও ১টি; প্রতিটি রুদ্ধদল দীর্ঘ, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা এবং মাত্রা ২টি। অর্থাৎ 'কলা'-ই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম **কলাবৃত্ত**। রুদ্ধদলের সার্বত্রিক সম্প্রসারণ হল **কলাবৃত্ত রীতির** প্রধান নিয়ম। কলাবৃত্ত রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তদলের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার হতেও দেখা যায়। ২ মাত্রার মুক্তদল আছে ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতায়, এবং আধুনিক কালের দু-চারটি বাংলা কবিতায়। প্রবোধচন্দ্র একে বলেন **প্রাচীন কলাবৃত্ত**। এর চলতি নাম অবশ্য 'প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্রত্নকলাবৃত্ত'। বৈষ্ণব পদাবলি গেয় কবিতা। গীতিকবিতা হওয়ার কারণে কবিরা প্রতি পর্বে বা পদে মাত্রাসংখ্যায় সমতা রক্ষা করেন। ফলে আমরা দেখি প্রয়োজনমতো স্থানে মুক্তদলের দৈর্ঘ্য ১ মাত্রা থেকে বেড়ে ২ মাত্রা হয়েছে। এই বৃদ্ধি তিন ধারার ছন্দেই হতে পারে। প্রাচীন এ-ধরনের রীতিটি ব্যবহৃত হয় বলে প্রাচীন দলবৃত্ত, প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মিশ্রবৃত্ত নামে একে অভিহিত করা হয়।

প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করলেন রুদ্ধদলের দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—একটি ১-মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব, আর একটি ২-মাত্রার কলাবৃত্ত স্বভাব। এর অর্থ, এ-রীতি আসলে দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রণেই তৈরি। এই কারণে এ রীতির নাম হল মিশ্রবৃত্ত। অতএব, যে ছন্দোরীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, আদি ও মধ্য রুদ্ধদল ১-মাত্রার, অন্ত্য এবং একক রুদ্ধদল ২-মাত্রার, তাকেই বলব মিশ্রবৃত্ত। এই রীতিও আসলে কলাবৃত্ত। তবে তাতে রুদ্ধদলের দুই রূপের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। এই বিশিষ্টতার জন্য এই রীতির নাম হয়েছে **মিশ্র-কলাবৃত্ত,** সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত** (composite)।

১১.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

১. বাংলা ছন্দের কয়টি রীতি? তাদের নামোল্লেখ করে একটি করে উদাহরণ দিন।

২. বাংলা ছন্দের রীতিগুলির নামান্তর লিখুন। একই সঙ্গে নামকরণকারীর নামোল্লেখ করুন।

৩. বাংলা ছন্দের রীতিগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৪. বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী? যে কোনো একটি পদ বিশ্লেষণ করে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

৫. দলবৃত্ত ছন্দের নামকরণ কে করেছেন? তিনি কী কারণে এই নামকরণ করেছেন?

৬. দলবৃত্ত ছন্দের মাত্রা বিভাজনগুলি আলোচনা করুন।

৭. 'মিশ্রবৃত্ত' ছন্দের পূর্বতন নাম কী ছিল? নামকরণ পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

১. কলাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

২. দলবৃত্ত ছন্দের শ্বাসাঘাত বলতে কী বোঝেন?

৩. মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দের মাত্রা বিভাজনগুলি আলোচনা করুন।

৪. দলবৃত্ত ছন্দের কে কী নামকরণ করছেন তা লিখুন।

৫. প্রত্নকলাবৃত্ত ছন্দ বলতে কী বোঝেন?

১১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. নূতন ছন্দ-পরিক্রমা- প্রবোধচন্দ্র সেন।

২. বাংলা ছন্দের মূল সূত্র- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

৩. আধুনিক বাংলা ছন্দ- নীলরতন সেন।

৪. বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা- নীলরতন সেন।

৫. ছন্দ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একক ১২: বাংলা ছন্দোবন্ধ

একক গঠন:

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ মূলপাঠ: বাংলা ছন্দোবন্ধ

১২.৩.১ পয়ার ও প্রাথমিক পরিচয়

১২.৩.১.১ আয়তনভেদে পয়ারের দুই রূপ

১২.৩.১.২ রীতিভেদে পয়ারের তিনরূপ

১২.৩.১.২.১ দলবৃত্ত (সাধারণ পয়ার, মহাপয়ার)

১২.৩.১.২.২ কলাবৃত্ত (সাধারণ পয়ার, মহাপয়ার)

১২.৩.১.২.৩ মিশ্রবৃত্ত (সাধারণ পয়ার, মহাপয়ার)

১২.৩.১.৩ গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের তিনরূপ

১২.৩.১.৩.১ অপ্রবহমান

১২.৩.১.৩.২ প্রবহমান (অমিত্রাক্ষর)

১২.৩.১.৩.৩ মুক্তক

১২.৩.২ চতুর্দশপদী

১২.৪ সারাংশ

১২.৫ অনুশীলনী

১২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

পূর্বের এককে দেওয়া হয়েছে বাংলা ছন্দের রীতি-পদ্ধতির ভাগ এবং সেসব রীতির নামান্তর। এবারে আমরা প্রবেশ করব ছন্দের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে। একে বলে ছন্দোবন্ধ। ছন্দোবন্ধ কাকে বলে, তার পরিচয় বিস্তৃত দেখব এই এককে। শিক্ষার্থী ছন্দের বিস্তৃততর ক্ষেত্রের পরিচয় পাবেন। সরলভাবে এককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ছন্দোবন্ধের নানা শাখা-প্রশাখা।

১২.২ প্রস্তাবনা

পূর্বের এককে আমরা দেখিয়ে এসেছি তিন রীতির ছন্দের পরিচয়। এবার আমরা দেখে নেব

ছন্দোবন্ধের পরিচয়। ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, আর ছন্দোবন্ধ' ছন্দের আকৃতি। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, 'ছন্দোবন্ধ' নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের ওপর। কোন্‌দল কত মাত্রা ধরে উচ্চারণ করব—এর ওপর নির্ভর করে ছন্দরীতি। মাত্রাবিন্যাসের পর যতি কোথায় পড়বে, অর্থাৎ পর্বের মাপ কত মাত্রার হবে, পর্বের পর পর্ব সাজিয়ে কীভাবে পঙ্‌ক্তি তৈরি করব—এর ওপর নির্ভর করে 'ছন্দোবন্ধ'।

১২.৩ মূলপাঠ: বাংলা ছন্দোবন্ধ

১২.৩.১ পয়ার ও প্রাথমিক পরিচয় (আয়তন, রীতি ও গতিভঙ্গিভেদ)

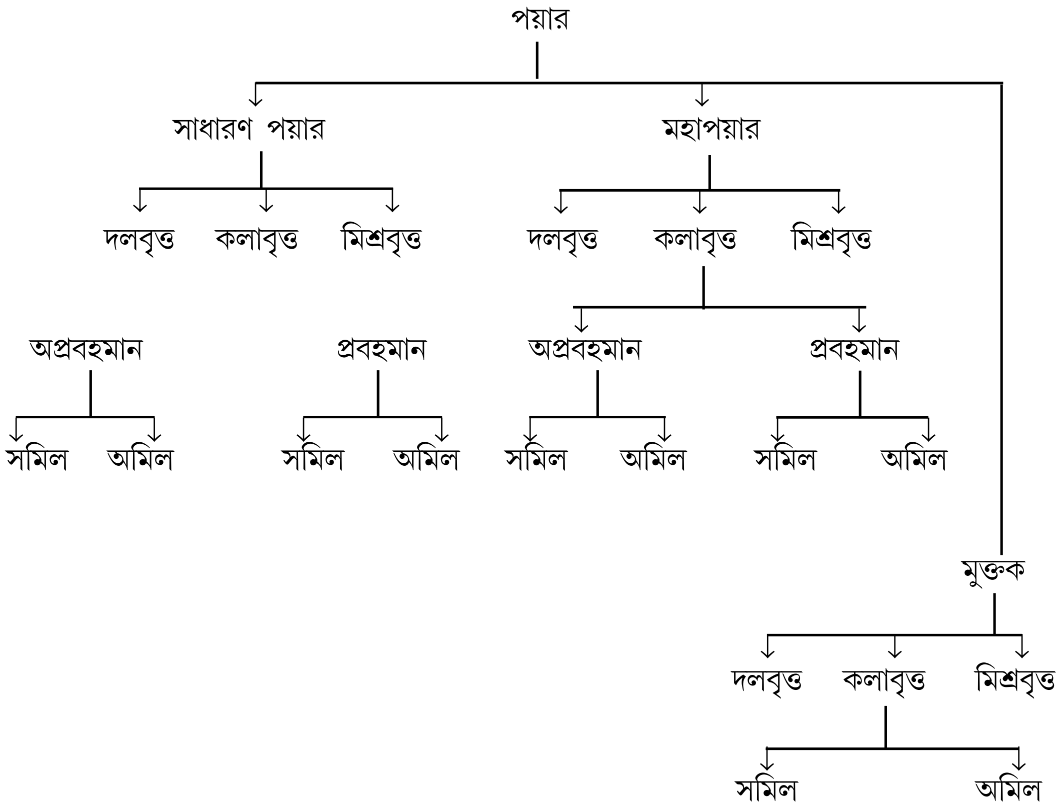

১. আয়তনভেদে পয়ারের দুই রূপ— ক. সাধারণ পয়ার খ. মহাপয়ার।

২. রীতিভেদে পয়ারের তিনরূপ— ক. দলবৃত্ত খ. কলাবৃত্ত গ. মিশ্রবৃত্ত।

৩. গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের তিনরূপ— ক. অপ্রবহমান খ. প্রবহমান গ. মুক্তক

৪. তিন রীতির পয়ারেরই তিন রকম গতিভঙ্গি হতে পারে।

৫. তিন রকম গতিভঙ্গিরই সমিল এবং অমিল রূপ লভ্য।

'পয়ার একটি ছন্দোবন্ধ-র নাম। ৮+৬ মাত্রার পদবিন্যাসে পঙ্‌ক্তি তৈরি হলে তার ছন্দোবন্ধের নাম 'পয়ার'। 'পয়ার' নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ।

প্রাচীন ছন্দোবন্ধে পয়ারের মূল লক্ষণ—

১ পদের পর্ববিভাগ থাকবে ৪+৪। ৪+২ = ৮+৬ মাত্রা। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৪ মাত্রার সাধারণ পয়ার পঙ্‌ক্তির কোনো নড়চড় হবে না।

২. পয়ারে সমিল এবং অমিল পঙ্‌ক্তি দুই-ই থাকতে পারে।

৩. প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ২টি করে পদ থাকবে।

৪. প্রথম পদ ৮ মাত্রার, দ্বিতীয় পদ ৬-মাত্রার হবে। পদের মাত্রাবিভাজন এর অন্যথা হবে না।

৫. সাধারণ পয়ারে ১৪ মাত্রা এবং মহাপয়ারে ৮+১০ = ১৮ মাত্রা থাকে।

১২.৩.১.১ আয়তনভেদে পয়ারের দুই রূপ

আয়তনের দিক থেকে পয়ারের ২টি রূপ: **সাধারণ পয়ার ও মহাপয়ার**। পয়ারের আয়তন ছিল নির্দিষ্ট— ৮+৬ মাত্রা। প্রথম পর্বের বা (পদের) ৮-মাত্রা ঠিক রেখে দ্বিতীয় পর্বের (বা পদের) দৈর্ঘ্য কোনো কোনো পয়ারে বাড়ানো হল—৬ মাত্রার বদলে ১০-মাত্রা। এর নাম হল বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার। অতএব, ৮+৬ মাত্রার পয়ার যেমনটি ছিল, তেমনই রইল, এর সঙ্গে যুক্ত হল ৮+১০ মাত্রার 'মহাপয়ার'। পয়ার ও মহাপয়ার — দু'রকম আয়তনেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এর পরেই। পুনরাবৃত্তি করা হল না।

১২.৩.১.২ রীতিভেদে পয়ারের তিনরূপ

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত—ছন্দ-রীতির দিক থেকে পয়ারের এই ৩টি রূপ আছে। পয়ার-বন্ধে লেখা পুরোনো সব কবিতারই একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, পয়ার-বন্ধে বাঁধা একটি আধুনিক কবিতার ছন্দরীতি **দলবৃত্ত** হতে পারে, **কলাবৃত্ত** হতে পারে, **মিশ্রবৃত্তও** হতে পারে।

বাংলা ছন্দের তিন রীতি ভেদে সাধারণ পয়ার ও মহাপয়ার, উভয়েরই তিন রূপ। যথাক্রমে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১২.৩.১.২.১ দলবৃত্ত পয়ার (৮+৬ মাত্রা)

আজ বিকালে কোকিল ডাকে। শুনে মনে লাগে,
বাংলাদেশে ছিলাম যেন।। তিন শো বছর আগে।

—'খেয়া', কোকিল

১২.৩.১.২.২ কলাবৃত্ত পয়ার (৮+৬ মাত্রা)

পূর্ণিমা রাত্রের।। জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা।। তন্দ্রা হারায়।

—**'চিত্রবিচিত্র', উৎসব**

১২.৩.১.২.৩ মিশ্রবৃত্ত পয়ার (৮+৬ মাত্রা)

জীবন মন্থন-বিষ।। নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল।। করে গেছ দান।

—**'চৈতালি', কাব্য**

তিনটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে মোট চোদ্দ মাত্রা। আট মাত্রার পরে অর্ধযতি, আর বাকি ছয় মাত্রার পরে পূর্ণযতি। অন্য ভাবে বলা যায়, প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি আট ও ছয় মাত্রার দুই পদে বিভক্ত। অতএব তিনটিই পয়ার। কিন্তু শুনতে তিন রকম। ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি তথা শ্রুতরূপ নির্ভর করে তার 'মাত্রাবিন্যাস' প্রণালীর উপরে। মাত্রা-নিরূপণ ও গণনা-প্রণালীর ভিন্নতার জন্যই উদ্ধৃত ত্রিবিধ পয়ার আকৃতিতে এক-রকম হলেও প্রকৃতিতে তিন রকম। তাই শুনতেও তিন রকম।

এবার আমরা দেখে নেব মহাপয়ারের উদাহরণ—

দলবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০)

ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, ।। এই এসিয়ায় দাঁড়াও সরে এসে,
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক।। -নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে।
ভাবসাধনার এই ভুবনে ।। এস তোমার নূতন বাণী লয়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ।। ভক্তমালে নূতন মণি হয়ে।

—**সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অভ্র-আবীর**

কলাবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০)

কখনো বা ফাগুনের ।। অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল।—
সমুখে অজানা পথ ।। ইঙ্গিত মেনে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে ।। যাত্রীর পাত্রটি পূরে
সদয় অতীত কিছু ।। সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটিবারে।

—**'নবজাতক', শেষবেলা**

মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০)

সত্য মূল্য না দিয়েই ।। সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় ।। নকল সে শৌখিন সে মজদুরি।

—**'জন্মদিনে' ১০, বিপুলা এ পৃথিবীর**

১২.৩.১.৩ গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের তিনরূপ

অপ্রবহমান, প্রবহমান ও মুক্তক

শুধু আয়তনভেদে (দৈর্ঘ্যভেদ) ও রীতিভেদে নয়, পয়ারের গতিভঙ্গিভেদের কথাও বলা প্রয়োজন। পুরো পঙ্‌ক্তির গতিভঙ্গিভেদে পয়ার ও মহাপয়ার উভয়েরই তিন রূপ— অপ্রবহমান, প্রবহমান ও মুক্তক। এখানে একে-একে তিন রীতির পয়ার ও মহাপয়ারের এই ত্রিবিধ গতিভঙ্গিভেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

১২.৩.১.৩.১ অপ্রবহমান পয়ার

মিশ্রবৃত্ত পয়ারের অপ্রবহমান রূপ

যে পয়ার পঙ্‌ক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে তাকেই বলা যায় অপ্রবহমান পয়ার। অপ্রবহমান মহাপয়ারেরও এই একমাত্র লক্ষণ। অপ্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ার সকলেরই সুপরিচিত। উপরে পয়ার ও মহাপয়ারের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সবই অপ্রবহমান। নূতন দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

১২.৩.১.৩.২ প্রবহমান পয়ার

মিশ্রবৃত্ত পয়ার ও মহাপয়ারের প্রবহমান রূপ

যে পয়ার বন্ধের প্রতি পঙ্‌ক্তির অন্তে পূর্ণযতি রাখা আবশ্যিক নয় তাকেই বলা হয় প্রবহমান পয়ার। অনুরূপ লক্ষণযুক্ত হলে মহাপয়ারও প্রবহমান হয়।

আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ার ও আট-দশ মাত্রাবিভাগের মহাপয়ার, এই দুই ক্ষেত্রেই আট মাত্রার পরে অর্ধযতি ও পঙ্‌ক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে। আর দুই পঙ্‌ক্তির শেষে থাকে মিল। এই ধরাবাঁধা নিয়মের দ্বারা ক্ষেত্রবিশেষে কবির স্বাধীনতা যে কিছু-পরিমাণে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। এই দুটি বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যে মধুসূদন সাধারণ পয়ারের অর্ধযতি ও পূর্ণযতি-স্থাপনকে অস্বীকার করে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে পঙ্‌ক্তির যে-কোনো স্থানে অর্ধযতি ও পূর্ণযতি স্থাপনের স্বাধীনতা অবলম্বন করলেন।

যতি ও মিলের বন্ধনমুক্ত এই নূতন পয়ারই পরিচিত হয়েছে **অমিত্রাক্ষর** নামে। আধুনিক পরিভাষায় তাকে বলা যায় **অমিল প্রবহমান পয়ার**। কেননা, অমিত্রাক্ষরতাই, অর্থাৎ মিলহীনতাই এই নূতন পয়ারের আসল লক্ষণ নয়। আসল লক্ষণ তার প্রবহমান গতি। প্রবহমান পয়ার সমিল হতেও বাধা নেই।

মধুসূদন-প্রবর্তিত এই মুক্তযতি ও মুক্তগতি অমিল পয়ার স্বভাবতঃই রচিত হয়েছিল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে। কেননা সেকালে মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দই ছিল সাধু সাহিত্যের একমাত্র বাহন। দলবৃত্ত রীতির ছন্দ ছিল লোকসাহিত্যের বাহন। সাধু সাহিত্যের আসরে তার প্রবেশাধিকার তখনও স্বীকৃত হয়নি। আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নূতন কলাবৃত্ত রীতির আবির্ভাব তখনও অনেক দূরবর্তী।

১। অমিল প্রবহমান পয়ার

সম্মুখ স : মরে পড়ি, ।। বীরচূড়া : মণি I = ৮+৬
বীরবাহু। চলি যবে। গেলা যম : পুরে I = ৮+৬
অকালে, ক : হ, হে দেবি। অমৃতভা : ষিণি, I = ৮+৬
কোন বীর : বরে বরি।। সেনাপতি :-পদে I = ৮+৬
পাঠাইলা : রণে পুনঃ ।। রক্ষঃ কুল : নিধি I = ৮+৬
রাঘবারি ?...........

—মধুসূদন, 'মেঘনাদবধ কাব্য', প্রথম সর্গ

২। সমিল প্রবহমান পয়ার

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।

— মেঘদূত

৩। সমিল প্রবহমান মহাপয়ার

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বরে অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

—**'সোনার তরী', সমুদ্রের প্রতি (১৮৯৩)**

যতিবিভাগের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। অথচ ছন্দের প্রবহমান গতি সুমসৃণ। রবীন্দ্ররচিত সবরকম প্রবহমান পয়ারেরই এই বিশিষ্টতা।

৪। অমিল প্রবহমান মহাপয়ার

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছি
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর
হতে মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পথ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

—**'প্রান্তিক'-১৩, একদা পরমমূল্য**

১২.৩.১.৩.৩ মুক্তক

'অপ্রবহমান পয়ার' পয়ারের সব শর্ত মেনে চলে, 'প্রবহমান পয়ার' কেবল ২-চরণের সীমানায় ভাবকে ধরে রাখার শাসনটুকু মানে না, আর সব শর্ত মেনে নিতে বাধা নেই। তবে, পয়ারের এই ২টি রূপেই প্রতিটি চরণের মাপ নির্দিষ্ট— ৮+৬ মাত্রা বা ৮+১০ মাত্রা। ক্রমশ পদ্যের স্তবক-রচনায় কবিরা চরণের এই নির্দিষ্ট আয়তন অস্বীকার করতে চাইলেন। ভাবকে ২-চরণের সীমানার বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে আনা তো হল-ই, সেইসঙ্গে চরণের মাপও নানারকম হতে লাগল, কখনো কখনো একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে স্তবক তৈরি করা হল। প্রতি চরণে ২টি পর্ব রাখার শর্তও ভেঙে গেল, ১টি পর্বেই তৈরি হল চরণ। তবে স্তবকটি যে মূলত পয়ারের, এটা বোঝা যাবে সবচেয়ে বড়ো চরণটির মাপ দেখে (৮+৬ বা ৮+১০)। কোনো-না কোনো চরণের এই মাপ থাকবেই। অন্য সব চরণের মাপ এর সমান হতে পারে, এর চেয়ে ছোটোও হতে পারে (৬, ৮ বা ১০-মাত্রা—যা পয়ারের ১টি পর্ব বা পদের মাপ)। এ-ধরনের পয়ারের নাম হল **মুক্তক পয়ার।**

আধুনিক পয়ার বৈচিত্র্য পেল আয়তন ছন্দরীতি আর গতিভঙ্গির দিক থেকে। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট আয়তনের পাশে এল ৮+১০ মাত্রার বড়ো 'পয়ার' বা 'মহাপয়ার'। মিশ্রবৃত্তি বা তানপ্রধান ছন্দরীতির পাশাপাশি তৈরি হতে লাগল দলবৃত্ত আর কলাবৃত্ত রীতির পয়ার। যে পয়ারে ভাবের গতি ছিল একটি-দুটি চরণে বদ্ধ— 'অপ্রবহমান', তা ক্রমশ 'প্রবহমান' হল ওই সীমানা পেরিয়ে। চরণে ৮+৬ বা ৮+১০ মাত্রার নির্দিষ্ট ছকও এরপর ভেঙে যেতে লাগল। এমনি করে তৈরি হল **'মুক্তক' পয়ার।** তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধকাব্য'-এ মধুসূদন যতি ও মিলের বন্ধন থেকে ছন্দকে মুক্তি দিলেও ১৪ মাত্রার সীমা কিন্তু নির্দিষ্ট ছিল। কালক্রমে সে-সীমাও অন্তর্হিত হল। মুক্তক পয়ারেরও দুই রূপ। সমিল ও অমিল। উদাহরণ দেওয়া যাক।

১. সমিল মুক্তক পয়ার

গিরিশিরে বরষায়। প্রবলা যেমতি (৮+৬)
ভীমা স্রোতস্বতী ৬
পথিক দুজনে হেরি। তস্করের দল (৮+৬)
নাবি নীচে করি কোলা : হল (৮+২)
উভে আক্রমিল। ৬

— **মধুসূদন, নীতিগর্ভ কাব্য**

২. অমিল মুক্তক পয়ার

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে। জ্বলে তারা, (৮+৪)
ধাবমান অন্ধকার। কালস্রোতে (৮+৪)
অগ্নির আবর্ত ঘুরে। ওঠে। (৮+২)

—**'পরিশেষ', 'প্রাণ'**

৩. সমিল মুক্তক মহাপয়ার

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি।
শুধু উজ্জ্বলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর।

— **দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র**

৪. অমিল মুক্তক মহাপয়ার

হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণ ডুবিছে অতলে।

—**'পরিশেষ', জরতী**

মোট কথা; সব রকম পয়ারেরই মূল অবলম্বন দুই মাত্রার অর্ধপর্ব, চার মাত্রার পূর্ণপর্ব, ছয় মাত্রার সার্ধপর্ব এবং আটমাত্রার যুক্তপর্ব। এই চার রকম মাত্রাবিভাগকে নির্দিষ্ট প্রণালীতে উপযতি, লঘুযতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতি দিয়ে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার সীমার মধ্যে সাজালেই হয় পয়ার বা মহাপয়ার। আর, যতি-স্থাপনের নির্দিষ্ট প্রণালী না মেনে এই মাত্রাবিভাগগুলিকে স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ গদ্যের মতো শুধু ভাবযতি অনুসারে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে গেলেই হয় প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার। সবশেষে, নির্দিষ্ট পঙ্‌ক্তিসীমার বাধাটুকুও সরিয়ে ফেলে কবিভাবনাকে স্বাধীনভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে গেলেই হয় মুক্তক পয়ার। তবু কিন্তু একটা সীমা মেনে চলতে হয়। দেখতে হয় কোনো ভাবতরঙ্গই যেন চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে না যায়।

১২.৩.২ চতুর্দশপদী

আপনারা দেখলেন, 'অমিত্রাক্ষর' পয়ারের একটি বিশেষ রূপ। এবারে দেখবেন, চতুর্দশপদীর জন্মও মূলত পয়ার-বন্ধেরই আর-একটি বিশেষ রকমের প্রয়োগ থেকে। আবার, অমিত্রাক্ষরের মতো 'চতুর্দশপদী'ও বাংলা সাহিত্যে এসেছে ইউরোপীয় ছন্দোবন্ধের আদলে। ইতালীয়, ইংরেজি, ফরাসি সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম সনেট, বাংলায় তারই নাম হল চতুর্দশপদী। তবে, বিকল্প নাম হিসেবে 'সনেট' শব্দটিও বাংলায় চালু।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা সনেটের প্রথম কবি। ষোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারোর প্রবর্তনায় শুরু হল ফরাসি সনেটের চর্চা। প্রায় একই সময়ে ইংরেজি সনেট-চর্চা শুরু হলেও সতেরো শতকের কবি সেক্সপিয়ারের হাতেই গড়ে উঠল স্বতন্ত্র রীতির সেক্সপিরীয় সনেট। এমনি করে তৈরি হল ইউরোপীয় সনেটের ৩টি আদর্শ—পেত্রার্কীয় ফরাসি আর সেক্সপিরীয়। এই ৩টি আদর্শই মধুসূদনের মাধ্যমে ক্রমশ বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী'র আশ্রয় হয়ে উঠল।

(১) প্রতিটি চরণ হবে পয়ারের—৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার বা ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ার। বাংলা সনেট বা 'চতুদর্শপদী'র প্রথম কবি মধুসূদনের মোট ১০৮টি কবিতার প্রতিটি চরণ ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ আর মোহিতলাল মজুমদার ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ারও প্রয়োগ করেছিলেন 'চতুর্দশপদী'তে।

(২) গোটা কবিতাই লেখা হবে কেবল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে।

(৩) স্তবক-বিভাগ হবে নির্দিষ্ট ছকে। সে ছক তৈরি হবে এই ৩টি আদর্শের যেকোনো ১টিতে—পেত্রার্কীয় ফরাসি শেক্সপিরীয়।

পেত্রার্কীয় আদর্শে একটি কবিতায় স্তবক থাকবে ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষটক)। ফরাসি আদর্শে ৩টি স্তবকের—প্রথম স্তবক ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ২-চরণের (যুগ্মক), তৃতীয়টি ৪-চরণের (চতুষ্ক)। সেক্সপিরীয় আদর্শে স্তবকের সংখ্যা ৪-প্রথম ৩টি ৪-চরণের (চতুষ্ক), শেষেরটি ২-চরণের (যুগ্মক)।

এ সব বিভাগ রূপের দিক থেকেও, ভাবের দিক থেকেও।

(৪) চরণশেষে মিল (অন্ত্যমিল) থাকবে। তবে সে মিল প্রতি ২-চরণের একঘেয়ে অন্ত্যমিল নয়। মিল তৈরি হবে নির্দিষ্ট ছকে, সে ছক উঠে আসবে নীচের ৩টি ইউরোপীয় আদর্শে যেকোনো ১টি থেকে।

পেত্রার্কীয় মিল—কখখখ-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক + ষট্‌ক

ফরাসি মিল—কখখখ-কখখক গগ চছচ্ছ = অষ্টক + যুগ্মক = চতুষ্ক

শেক্সপিরীয় মিল—কখকখ-গঘগঘ পফপফ চচ = চতুষ্ক + চতুষ্ক + চতুষ্ক + যুগ্মক

চরণের শেষ দলের (বা অক্ষরের) উচ্চারণ থেকেই সাধারণ অন্ত্যমিল তৈরি হয়। ক খ গ ঘ চ ছ জ প ফ—এক-একটি বর্ণ 'চতুর্দশপদী' এক-একটি চরণের শেষ দলের উচ্চারণের চিহ্ন। পরের

দৃষ্টান্তগুলিতে চরণশেষে এসব চিহ্ন পরপর সাজিয়ে মিলের ছক নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন। তখন দেখবেন, প্রতিটি 'চতুর্দশপদী'র মিলের ছক কোনো-না-কোনো আদর্শের আদলে তৈরি। তবে দুটি-একটি এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়বে, যেখানে নির্দিষ্ট আদর্শ পুরোপুরি মানা হয়নি। বাঙালি কবিরা 'চতুর্দশপদী' লিখতে গিয়ে একটু স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতাই কেবল ৭টি যুগ্মকের সমষ্টি—অর্থাৎ, ২-চরণের ৭টি অন্ত্যমিল সাজানো এক একটি 'চতুর্দশপদী'।

অতএব, একটি ১৪-চরণের কবিতা ওপরের ৪টি শর্ত মানলে তবেই হয়ে ওঠে 'চতুর্দশপদী'। এর অন্তর্গত ভাব প্রবহমান হতে পারে, না-ও হতে পারে। অর্থাৎ, ছেদ-যতির মিলন থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে।

ইতালি, ইংরেজ, ফরাসি সনেটের আদলে তৈরি বাংলা কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম **চতুর্দশপদী**।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা, যোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারো, আর সতেরো শতকের ইংরেজ কবি শেক্সপিয়ার—এঁদের হাতে তৈরি হল সনেটের ৩টি আদর্শ। এই ৩টি আদর্শেই লেখা হতে লাগল বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী', এই ধারার প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত।

'চতুর্দশপদী' কবিতাকে ১৪-চরণের কাঠামো নিয়ে আরও ৪টি শর্ত মেনে চলতে হয়—প্রতিটি চরণ পয়ারের, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, পেত্রার্কীয় ফরাসি বা শেক্সপিরীয় ছকে স্তবক-বিভাগ, একই ছকে চরণ-শেষের মিল। ছক-তিনটি এইরকম—

ছক	**স্তবক-বিভাগ**	**চরণশেষের মিল**
পেত্রার্কীয়	৮-চরণ (অষ্টক) + ৬-চরণ ((ষট্‌ক)	কখখক-কখখক চছজ-চছজ
ফরাসি	৮-চরণ (অষ্টক) + ২-চরণ (ষট্‌ক) + ৪-চরণ (চতুষ্ক)	কখখক-কখখক গগ-চছজ
সেক্সপিরীয় ৪	চরণ (চতুষ্ক) + ৪-চরণ (ষট্‌ক) + ৪-চরণ + ২-চরণ (যুগ্মক)	কখখক-গঘগঘ পফপফ-চচ

ক খ গ ঘ প ফ চ ছ জ—এগুলি চরণশেষের মিলের চিহ্ন।

তবে ইউরোপীয় আদর্শের ছক বাঙালি সনেট-কারেরা সবসময় মেনে চলেননি। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতা কেবল ১৪-চরণের মিশ্রবৃত্ত পয়ার, অথচ 'চতুর্দশপদী' নামেই চালু।

১২.৪ সারাংশ

আয়তনভেদে পয়ারের দুই রূপ—ক. সাধারণ পয়ার খ. মহাপয়ার। রীতিভেদে পয়ারের তিনরূপ ক. দলবৃত্ত খ. কলাবৃত্ত গ. মিশ্রবৃত্ত। গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের তিন রূপ— ক. অপ্রবহমান খ. প্রবহমান গ. মুক্তক। তিন রীতির পয়ারেরই তিন রকম গতিভঙ্গি হতে পারে। তিন রকম গতিভঙ্গিরই সমিল এবং অমিল রূপ লভ্য। পয়ার একটি ছন্দোবন্ধ-র নাম। ৮+৬ মাত্রার পদবিন্যাসে পঙ্‌ক্তি তৈরি হলে

তার ছন্দোবন্ধের নাম 'পয়ার'। 'পয়ার' নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। পদের পর্ববিভাগ থাকবে ৪+৪। ৪+২ = ৮+৬ মাত্রা। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৪ মাত্রার সাধারণ পয়ার পঙ্‌ক্তির কোনো নড়চড় হবে না। পয়ারে সমিল এবং অমিল পঙ্‌ক্তি দুই-ই থাকতে পারে। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ২টি করে পদ থাকবে। প্রথম পদ ৮ মাত্রার, দ্বিতীয় পদ ৬ মাত্রার হবে। পদের মাত্রাবিভাজন এর অন্যথা হবে না। সাধারণ পয়ারে ১৪ মাত্রা এবং মহাপয়ারে ৮+১০ = ১৮ মাত্রা থাকে। দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত—ছন্দ-রীতির দিক থেকে পয়ারের এই ৩টি রূপ আছে। পয়ার-বন্ধে লেখা পুরোনো সব কবিতারই একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, পয়ার-বন্ধে বাঁধা একটি আধুনিক কবিতার ছন্দরীতি **দলবৃত্ত** হতে পারে, **কলাবৃত্ত** হতে পারে, **মিশ্রবৃত্ত**ও হতে পারে।

সব রকম পয়ারেরই মূল অবলম্বন দুই মাত্রার অর্ধপর্ব, চার মাত্রার পূর্ণপর্ব, ছয় মাত্রার সার্ধপর্ব এবং আটমাত্রার যুক্তপর্ব। আর, যতি-স্থাপনের নির্দিষ্ট প্রণালী না মেনে এই মাত্রাবিভাগগুলিকে স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ গদ্যের মতো শুধু ভাবযতি অনুসারে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে গেলেই হয় প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার। সবশেযে, নির্দিষ্ট পঙ্‌ক্তিসীমার বাধাটুকুও সরিয়ে ফেলে কবিভাবনাকে স্বাধীনভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে গেলেই হয় মুক্তক পয়ার।

চতুর্দশপদীর জন্মও মূলত পয়ার-বন্ধেরই আর-একটি বিশেষ রকমের প্রয়োগ থেকে। 'চতুর্দশপদী'ও বাংলা সাহিত্যে এসেছে ইউরোপীয় ছন্দোবন্ধের আদলে। দুটি ছন্দোবন্ধই অনেকটা দেশি টবে ফুটে ওঠা বিদেশি ফুলের মতো, এদেশে ফুটিয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত। ইতালীয়—ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম সনেট, বাংলায় তারই নাম হল চতুর্দশপদী। তবে, বিকল্প নাম হিসেবে 'সনেট' শব্দটিও বাংলায় চালু। চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা সনেটের প্রথম কবি। যোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারোর প্রবর্তনায় শুরু হল ফরাসি সনেটের চর্চা। প্রায় একই সময়ে ইংরেজি সনেট-চর্চা শুরু হলেও সতেরো শতকের কবি শেক্সপিয়ারের হাতেই গড়ে উঠল স্বতন্ত্র রীতির সেক্সপিরীয় সনেট। এমনি করে তৈরি হল ইউরোপীয় সনেটের ৩টি আদর্শ—পেত্রার্কীয় ফরাসি আর সেক্সপিরীয়। এই ৩টি আদর্শই মধুসূদনের মাধ্যমে ক্রমশ বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী'র আশ্রয় হয়ে উঠল। 'চতুর্দশপদী' কথাটির সরল অর্থ '১৪টি পদ দিয়ে তৈরি' কবিতা। কিন্তু, বাংলায় যে ধরনের কবিতা 'চতুর্দশপদী' নামে চিহ্নিত, তার শরীর ১৪টি চরণ দিয়ে গড়া, ১৪টি পদ দিয়ে নয়। পদ' কথাটির বিশেষ অর্থ এখানে 'চরণ। 'চতুর্দশপদী' হবার জন্য প্রতিটি চরণ হবে পয়ারের—৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার বা ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ার। গোটা কবিতাই লেখা হবে কেবল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে। স্তবক-বিভাগ হবে নির্দিষ্ট ছকে। সে ছক তৈরি হবে এই ৩টি আদর্শের যেকোনো ১টিতে—পেত্রার্কীয় ফরাসি সেক্সপিরীয়। চরণশেষে মিল (অন্ত্যমিল) থাকবে। তবে সে মিল তৈরি হবে নির্দিষ্ট ছকে। ইতালি-ইংরেজ-ফরাসি সনেটের আদলে তৈরি বাংলা কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম চতুর্দশপদী।

১২.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

১. 'পয়ার' কাকে বলে? তার বিভাজনগুলি উল্লেখ করুন।

২. রীতিভেদে পয়ারের কয়টি রূপ? প্রত্যেক প্রকার পয়ারের একটি করে উদাহরণ দিন।

৩. আয়তনভেদে পয়ারের কয়টি রূপ? একটি করে উদাহরণ দিন।

৪. গতিভঙ্গিভেদে পয়ারের রূপগুলির পরিচয় দিন।

৫. 'পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘক পয়ার' নামকরণ কে করেছেন? তার এই নামকরণ করার কারণ কী?

৬. মুক্তক ছন্দ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে তার স্বরূপ বুঝিয়ে দিন।

৭. চতুর্দশপদী ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী? বুঝিয়ে বলুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

১. সমিল মহাপয়ার কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

২. অমিল পয়ারের ছন্দ বিভাজন করে আলোচনা করুন।

৩. দলবৃত্ত ছন্দের পয়ারের দুটি উদাহরণ দিন।

৪. সমিল যুক্তক পয়ার কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৫. অষ্টক ও ষটক কাকে বলে?

১২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. নূতন ছন্দ-পরিক্রমা— প্রবোধচন্দ্র সেন।

২. বাংলা ছন্দের মূল সূত্র— অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

৩. আধুনিক বাংলা ছন্দ— নীলরতন সেন।

৪. বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা— নীলরতন সেন।

৫. ছন্দ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একক ১৩: বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ

একক গঠন:

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ ছন্দলিপি নির্মাণ-পদ্ধতি

১৩.৪ মূলপাঠ: বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ

১৩.৫ সারসংক্ষেপ

১৩.৬ অনুশীলনী: ছন্দোলিপি প্রস্তুত করুন

১৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককগুলিতে আমরা বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। ছন্দের পাঠ সম্পূর্ণ করতে হলে এবার প্রয়োজন হাতে কলমে মক্শো করা। অর্থাৎ বিবিধ প্রকার বাংলা কবিতার ছন্দোলিপি প্রস্তুত করার নিয়ম বা প্রণালী। এই এককের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মনোবল বৃদ্ধি করা, যাতে তার পক্ষে ভবিষ্যতে ছন্দ সম্পর্কে ধোঁয়াশা দূর হয়।

১৩.২ প্রস্তাবনা

ছন্দ চিনে হাতে-কলমে দেখাতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছন্দলিপি নির্মাণ। ছন্দলিপি প্রস্তুত করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে আরোহণ পদ্ধতিতে ছকটি নির্মিত হয়। তবে একথাও বলে রাখা ভালো, সব কবিতায় যে একই রকম ছক ব্যবহৃত হবে, এমন কোনো কথা নেই। আবার নির্দিষ্ট ছকের পরিবর্তে টানা লেখায়ও ছন্দবিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৫.৩ ছন্দলিপি-নির্মাণের পদ্ধতি

ছন্দলিপির ছক: **উদ্ধৃত উদাহরণে**

১. প্রতি চরণে পর্বসংখ্যা—

২. পূর্ণপর্ব—, অপূর্ণপর্ব—

৩. পূর্ণপর্বে মাত্রাসংখ্যা—

৪. অপূর্ণপর্বে মাত্রাসংখ্যা—

৫. প্রতি চরণে পদসংখ্যা—
৬. পঙ্ক্তিসংখ্যা—
৭. স্তবকসংখ্যা—
৮. মাত্রাগণনারীতি—
৯. লয়—
১০. ব্যতিক্রম—
১১. ছন্দোরীতি—

অথবা

চতুর্মাত্রিক/পঞ্চমাত্রিক/ষণ্মাত্রিক/সপ্তমাত্রিক পর্বের একপদী/দ্বিপদী/ত্রিপদী/ চৌপদী একটি/দুটি/ তিনটি পঙ্ক্তি। স্তবকসংখ্যা—। মাত্রাগণনা পদ্ধতি—। ছন্দোরীতি—।

১৩.৪ মূলপাঠ: বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ

উপরের ১১-দফা কাজ অথবা টানা লেখাটি অনুসরণ করে গেলেই তৈরি হবে একটি স্তবকের ছন্দ-লিপি। ছন্দ-বিশ্লেষণ করার সময় প্রথমে উদাহরণের অংশটুকু দল অনুসারে বিশ্লেষণ করে লিখতে হবে। পর পর উদাহরণ দিই—

১. মুদিত আলোর্। কমল-কলিকা। -টিরে ৬+৬+২ (দুটি পর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
রেখেছে সন্ধ্যা। আঁধার্-পর্ণ।-পুটে I ৬+৬+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)
উতরিবে যবে। নব প্রভাতের্। তীরে ৬+৬+২ (দুটি পর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব মিলিয়ে একটি পদ)
তরুণ্ কমল্। আপনি উঠিবে। ফুটে।I ৬+৬+২ (দুটি পদ মিলিয়ে একটি পঙ্ক্তি)

ষণ্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্ক্তি। স্তবকসংখ্যা ১টি। প্রতি মুক্তদল ১ মাত্রা ও রুদ্ধদল ২ মাত্রা পেয়েছে। এটি কলাবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

২. এ দুর্ভাগ্য। দেশ হতে। হে মঙ্গল।-ময়, I ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)
দূর করে। দাও তুমি ।। সর্বতুচ্ছ। ভয়। I ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)
মস্তক্ : -লিতে দাও ।। অনন্ত আ :-কাশে I ৪+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি পঙ্ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)
উদার আ :-লোক্ মাঝে।। উন্মুক্ত বা :-তাসে। I ১৮+৪। ৪+২ (দুটি পদ, একটি

পঙ্‌ক্তি। ১৪ মাত্রার পয়ার।)

চতুর্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী চারটি পয়ার পঙ্‌ক্তি। স্তবক ১টি। প্রতি মুক্তদল একমাত্রা এবং অন্ত্যরুদ্ধদল ও একক রুদ্ধদল ২ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি মিশ্রবৃত্ত রীতির উদাহরণ।

পরের উদাহরণগুলিতে রুদ্ধ-মুক্ত পৃথক করে দেখানো হল না।

৩. ১১১ ১১ । ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১ ১ । ২
সবই হেথায় । একটা কোথাও ।। করতে হয় রে। শেষ, I (৪+৪। ৪+২)
১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১১ ।। ১ ১ ১ ১ । ২
গান থামিলে। তাই তো কানে ।। থাকে গানের। রেশ। I (৪+৪। ৪+২)
১ ১ ১ ১ । ১ ১ ১১ ।। ১ ১১ ১। ১১
কাটলে বেলা। সাধের খেলা ।। সমাপ্ত হয়। বলে I (৪+৪। ৪+২)
১ ১ ১ ২ । ১ ১ ১ ১ ।। ১ ১ ১১। ১১
ভাবনাটি তার। মধুর থাকে ।। আকুল অশ্রু। জলে। I (৪+৪। ৪+২)

চতুর্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী চারটি পঙ্‌ক্তি। স্তবক ১টি। মুক্তদল এবং রুদ্ধদল নির্বিশেষে ১ মাত্রা করে পেয়েছে। এটি দলবৃত্ত রীতির উদাহরণ। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির অন্তে 'শেষ' এবং 'রেশ' ২ মাত্রা করে পেয়েছে।

৪. ১১১ ১১। ১ ২ ১১ ।। ১১ ১ ২। ২ ১ ১
ভরিয়া উঠে। নিখিল ভব।। 'রতি-বিলাপ'।-সঙ্গীতে, ৫+৫। ৫+৪
১ ২ ২। ১ ১১ ১ ১ । ১১১
সকল দিক। কাঁদিয়া উঠে।। আপনি। I ৫+৫। ৩
১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১১ ২। ২ ১ ১
ফাগুন মাসে। নিমেষ-মাঝে ।। না জানি কার। ইঙ্গিতে ৫+৫। ৫+৪
১১১ ১১।১১১ ১১ ১১১
শিহরি উঠি। মূরছি পড়ে । অবনী। I ৫+৫। ৩

কলাবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রিক পর্বের চৌপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। চতুর্থ পদ অপূর্ণ। দুটি পঙ্‌ক্তিতে মাত্রাসজ্জা (১০+৯), (১০+৩)। রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২ মাত্রা এবং মুক্তদল ১ মাত্রা করে গণনা করা হয়েছে।

৫. **আমি** হব না ভাই। নববঙ্গে ।। নবযুগের। চালক, I ৪+৪। ৪+২ (দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি)
আমি জ্বালাব না। আঁধার দেশে সুসভ্যতার। আলোক। I ৪+৪। ৪+২ (দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি)
যদি ননি-ছানার। গাঁয়ে ।। ৪+২
কোথাও অশোক-নীপের। ছায়ে। ৪+২
আমি কোনো জন্মে। পারি হতে ।। ব্রজের গোপ। বালক, I ৪+৪। ৪+২ (ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি)

তবে চাই না হতে। নববঙ্গে। নবযুগের। চালক। I 8+8। 8+২ (দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি)

দলবৃত্ত রীতিতে রচিত এই কবিতায় 'আমি', 'যদি', 'কোথাও', 'তবে' শব্দগুলি অর্থবহ দ্বিমাত্রক। এগুলি 'অতিপর্ব। চতুর্মাত্রক পর্বের তিনটি দ্বিপদী ও একটি ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিল।

৬. চম্পক। তরু মোরে ।। প্রিয়সখা। জানে সে,
গন্ধের। ইঙ্গিতে।। কাছে তাই। টানে যে-।

কলাবৃত্ত চতুর্মাত্রিক পর্বের পূর্ণ দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি। 8+8। 8+8 মাত্রা। 'সে' এবং 'যে' শব্দদুটি প্রসারিত হয়ে দুইমাত্রা পেয়েছে।

৭. এখন বিঃশ্বের তুমি,। গুন্‌গুন্ মধুকর।
চারি দিকে। তুলিয়াছে বিস্ময়-ব্যা:কুল স্বর।

মিশ্রবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী—8+8। 8+8 মাত্রা। 'বিশ্বের' এবং 'ব্যাকুল' শব্দদুটিতে পর্বযতি অনাঘাতি।

৮. সম্মুখ স : মরে পড়ি, ।। বীরচূড়া : মণি I = ৮+৬
বীরবাহু। চলি যবে।। গেলা যম : পুরে I = ৮+৬
অকালে, ক : হ, হে দেবি।। অমৃতভা : ষিণি, I = ৮+৬
কোন্‌বীর : বরে বরি।। সেনাপতি :-পদে I = ৮+৬
পাঠাইলা : রণে পুনঃ। রক্ষঃ কুল : নিধি I = ৮+৬
রাঘবারি?....

(অমিল প্রবহমান পয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।।)

৯. কবিবর, কবে কোন্। বিস্মৃত বরষে I = ৮+৬
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের। প্রথম দিবসে I = ৮+৬
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক I = ৮+৬
বিশ্বের বিরহী যত। সকলের শোক I = ৮+৬
রাখিয়াছে আপন আঁ:ধার স্তরে স্তরে I = ৮+৬
সঘন সঙ্গীত মাঝে। পুঞ্জীভূত করে। I = ৮+৬

(সমিল প্রবহমান পয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।)

১০. হে আদিজননী সিন্ধু,। বসুন্ধরা সন্তান তোমার, = ৮+১০

একমাত্র কন্যা তব। কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর = ৮+১০
চক্ষে তব, তাই বক্ষ। জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা, = ৮+১০
সদা আন্দোলন; তাই। উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা = ৮+১০
নিরন্তর প্রশান্ত অ:ম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে = ৮+১০
অন্তরের অনন্ত প্রা:র্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে = ৮+১০
ধ্বনিত করিয়া দিশি। দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে = ৮+১০
অসংখ্য চুম্বন কর। আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে = ৮+১০
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি,। নীলাম্বরে অঞ্চলে তোমার = ৮+১০
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি। সন্তর্পণে দেহখানি তার = ৮+১০
সুকোমল সুকৌশলে। = ৮

'সমিল প্রবহমান মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।'

১১. একদা পরমমূল্য। জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়।
আগন্তুক। রূপের দু:র্লভ সত্তা লভিয়া বসেছি
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি। ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি। তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের। সাথে; দূর যুগান্তর
হতে মহাকালযাত্রী। মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে স:ম্মান; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ। গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী। অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

(অমিল প্রবহমান মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।)

১২. গিরিশিরে বরষায়। প্রবলা যেমতি (৮+৬)
ভীমা স্রোতস্বতী ৬
পথিক দুজনে হেরি। তস্করের দল (৮+৬)
নাবি নীচে করি কোলা : হল (৮+২)
উভে আক্রমিল। ৬

(সমিল মুক্তক পয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।)

১৩. বহু লক্ষ বর্ষ ধরে। জ্বলে তারা, (৮+৪)
ধাবমান অন্ধকার। কালস্রোতে (৮+৪)
অগ্নির আবর্ত ঘুরে। ওঠে। (৮+২)

(অমিল মুক্তক পয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।)

১৪. এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজ্জ্বলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর

(সমিল মুক্তক মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।)

১৫. হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণ ডুবিছে অতলে।

(অমিল মুক্তক মহাপয়ার। মিশ্রবৃত্ত রীতি।)

১৬. ১ ১ ১ ২ ১ ২ । ১ ১ ১ ১ ১ ১ ।। ১১১ ২ ১ : ২ = ৬+৬। ৬+২ = ২০
আমি বিধির্ বিধান্। ভাঙিয়াছি আমি ।। এমনি শক্‌তি:মান্ I
১১ ১১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২ ।। ১১ ১১ ১১। ২
মম চরণের তলে। মরণের মার্ ।। খেয়ে মরে ভগ:বান্। I = ৬+৬। ৬+২ = ২০

সংকেত-চিহ্ন: অর্ধযতি (।।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি: মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদল নির্বিশেষে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি: যণ্মাত্রক পর্বের কলাবৃত্ত দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

পর্ব: অপূর্ণপর্বে ২-মাত্রা।

চরণ: প্রতি চরণে ৪টি পর্ব (৬+৬+৬+২), চরণশেষে মিল (মান্-বান্)।

স্তবক: ৪-পর্বের ২০-মাত্রার সমিল ২টি চরণের স্তবক।

বৈশিষ্ট্য : ১. প্রতি পঙ্‌ক্তির শুরুতে ১টি করে অতিপর্ব রয়েছে (আমি, মম)।

২. লঘুযতির আঘাতে 'শক্‌তিমান' আর 'ভগবান' শব্দদুটি ভেঙেছে।

১৭. ২ ১ ২ ১ । ২ ১ ১ ১ ১ ।। ২ ১ ১ ১১ ২ ১

দে-শ দে-শ । নন্‌দিত করি ।। মন্‌দ্রিত তব । ভে-রী I = ৬+৬ । ৬+৩ = ২১

২ ১ ১ ১ ১ । ২ ১ ২ ১ ।। ২ ১ ১ ১১ । ২ ১

আ-সিল যত । বী-রবৃন্‌দ ।। আ-সন তব । ঘে-রি I = ৬+৬ । ৬+৩ = ২১

সংকেত-চিহ্ন : লঘুযতি (।) অর্ধযতি (।।) পূর্ণযতি (I); মাত্রা (১,২)

মাত্রারীতি : প্রতি মুক্তদলে ১-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

ছন্দরীতি : প্রাচীন কৃলাবৃত্ত। ষণ্মাত্রিক পর্বের দ্বিপদী দুটি পঙ্‌ক্তি।

পর্ব : অপূর্ণপর্বে ৩-মাত্রা।

মিল : পঙ্‌ক্তি শেষে মিল (ভেরী-ঘেরি)।

বৈশিষ্ট্য : ১. আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাচীন কলাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দরীতির প্রয়োগ ঘটেছে।

১৩.৫ সারসংক্ষেপ

এই এককে ছন্দলিপির গঠন প্রসঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা ছন্দ নির্ণয়, ছন্দ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ছন্দলিপি নির্মাণ করতে শিখবে। এই সূত্রে বিভিন্ন কবিতার, পদ্যের ছন্দবিশ্লেষণ ও ছন্দলিপি নির্ণয়, ছন্দরীতি চিহ্নিতকরণ করতে শিখবে শিক্ষার্থী। অনুশীলনগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছন্দনির্ণয় সংক্রান্ত ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।

১৩.৬ অনুশীলনী ঃ ছন্দোলিপি প্রস্তুত করুন

১. বাহুর দম্ভ রাহুর মতো একটু সময় পেলে
নিত্য কালের সূর্যকে সে এক গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মিলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।

২. দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্‌ ডিম্‌ রবে,
সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে।...
ওই শুনি পথে পথে হৈ হৈ ডাক,

বংশীর সুরে তালে বাজে ঢোল ঢাক।
নন্দিত কণ্ঠের হাস্যের রোল
অম্বর তলে দিল উল্লাস দোল।

৩. ভরিয়া উঠে নিখিল ভব 'রতি-বিলাপ'-সঙ্গীতে,
সকল দিক্ কঁদিয়া উঠে আপনি
ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মূরছি পড়ে অবনী।
আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।

৪. আমি হে সতী নব যুবতী,
আয়ান পতি দুর্জন অতি।...
'পাপ আয়ানে' শুনিলে প্রাণে..
বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী,
'আমি রমণী' প্রমাদ গণি।

৫. দেশের জন্য ভাবা, মায়ের জন্য কাঁদা, ভায়ের জন্য দেওয়া একালে
'এই' বঙ্গদেশে 'আজো যে সম্ভব তা', হে মহাত্মা, তুমি শেখালে।...
ওরে মূর্খ, জানিস্ মা মা বলে শখের অশ্রু ফেলা বেশি শক্ত নয়,
যে-জন চেঁচায় বেশি 'দীনবন্ধু' বলে সে-জন সত্যই বেশি ভক্ত নয়।

৮. হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা,
ভ্রমর ফিরেছে মাধবী-কুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা।....
শুনিয়া তপন্ অস্তে নামিল, শরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল, বনের আড়াল ধরি।

৭. এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

৮. পথ যে কতখানি কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে চৈত্র-ফসলের দেশে।

৯. আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ পূজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্র মাস অষ্টমী সুপ্রকাশ বিশদ পক্ষ শুভক্ষণে ।।....
দেউল-বেদীপর প্রতিমা মনোহর তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।

সর্বতোভদ্র নাম মণ্ডল চিত্র-নাম লিখিলা আপনি বিধাতা।।

১০. কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি,
বোঝাই-করা কলসি, হাঁড়ি
গাড়ি চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।

১২. মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

১৩. আমি হব না ভাই নববঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে ব্রজের গোপবালক,
তবে চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।

২৪. চাঁদটি ব'সে হাসে
শান্ত নীলাকাশে।
ডাকে মা—চাঁদ, আরে,
চি-ক দিয়ে যা রে।
একবার তাকায় সাধে,
আকাশের ঐ চাঁদে,
আবার তাকায় সুখে
কোলের চাঁদের মুখে।

১৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. নূতন ছন্দ-পরিক্রমা- প্রবোধচন্দ্র সেন।
২. বাংলা ছন্দের মূল সূত্র- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।
৩. আধুনিক বাংলা ছন্দ- নীলরতন সেন।
৪. বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা- নীলরতন সেন।
৫. ছন্দ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মডিউল ৪: বাংলা অলংকার

একক ১৪: অলঙ্কার কী ও তার প্রকারভেদ

একক গঠন :

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ ভূমিকা

১৪.৩ মূলপাঠ

১৪.৪ সারাংশ

১৪.৫ অনুশীলনী

১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল বাংলা কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, তার সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা।

দ্বিতীয়ত, কাব্যের অলংকার সম্বন্ধে ভারতীয় আলংকারিকদের চিন্তাভাবনার বিষয়ে আরও বিশদ জানার আগ্রহ তৈরি করা।

তৃতীয়ত, কবিতায় অলংকারের মূল বিভাগ ও তাদের পার্থক্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা।

১৪.২ ভূমিকা

কাব্যরচনা নিছকই শব্দসজ্জা নয়। সংস্কৃত 'অলম্'-এর একটি অর্থ 'ভূষণ' বা সাজসজ্জা। শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য শরীরকে সাজানো হয় গয়না দিয়ে, তাই গয়না শরীরের অলংকার। রচনাকে সুন্দর করার জন্য যে আয়োজন, তাও অলংকার। সেই অলংকারে সাজানো হলে তবেই কোনো রচনা হবে কাব্য। আজ আমাদের আলোচনা সেই সজ্জাকে নিয়েই। প্রথমে আমরা জেনে নিই অলংকার বলতে আমরা কী বুঝি।

১৪.৩ মূল পাঠ

অলঙ্কার কী ও তার প্রকারভেদ

ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' অলংকারের উল্লেখ হয়েছিল দু-হাজার একশ বছর আগে, যথা— উপমা, দীপক, রূপক, যমক এই চারটি অলংকার। ভারতবর্ষে অলংকার-চর্চার এই হল সূচনা। দেড় হাজার বছর

আগে থেকে শুরু হয়েছিল অলংকার নিয়ে নানা বিতর্ক। ছ-শতকের আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' ভরতমুনির চারটি অলংকার বেড়ে হল ছত্রিশটি। তাঁর মতে, যেসব ধর্ম কাব্যে শোভা এনে দেয় তার নাম অলংকার। ('কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে')। সাত-শতকের আচার্য ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের বক্রোক্তি-তত্ত্ব পেরিয়ে যখন আট শতকে পৌঁছই, তখন দেখি, বামনাচার্য অলংকার সম্পর্কে একটি মূল্যবান সূত্র নির্দেশ করছেন তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে। যেখানে তিনি বলেন কোনো রচনা মানুষের কাছে উপাদেয় এবং কাব্য বলে গ্রাহ্য হয় অলংকারের জন্যই, আর সৌন্দর্যই হচ্ছে সেই অলংকার ('কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্করাৎ। সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ')।

বামনাচার্যের এই সূত্রটি আজকের বাংলা কবিতার অলংকার বুঝতেও অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃত কাব্যের অলংকার নিয়ে আলোচনা পালটা আলোচনা চলেছে সতেরো-শতক পর্যন্ত। বামনাচার্যের সূত্রটি ক্রমশ দুটি মাত্রা পেল—এক, অলংকার কাব্যের সাধারণ (আত্মভূত) সৌন্দর্য; দুই অলংকার কাব্যের বিশেষ (অঙ্গভূত) সৌন্দর্য। চৌদ্দ-শতকের বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকারের এই দ্বিতীয় মাত্রাটি ধরে ছিয়াত্তরটি অলংকারের আলোচনা করলেন তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে।

কবিতার মতো অলংকারের আয়তনও অনির্দিষ্ট। ভাষায় অলংকার শব্দকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে। একটি অলংকার একটিমাত্র শব্দকে আশ্রয় করতে পারে, একটি-দুটি চরণ বা বাক্য জুড়ে থাকতে পারে, কবিতার একটি স্তবক বা ছোটোমাপের একটি কবিতার শরীরেও ছড়াতে পারে। কবিতা বা তার অন্তর্গত স্তবক-চরণ বাক্যে শব্দের দুটি রূপ—একটি ধ্বনিরূপ, আর একটি অর্থরূপ। শব্দের দুটি অংশ। বাইরের উচ্চারণে সে ধ্বনি, ভিতরে সে অর্থময়। যা শ্রুতিযোগ্য, ইংরেজিতে তাকে সাউন্ড বলে। ভিতরের অর্থকে বলে সেন্স। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, তার আবেদন শ্রুতির কাছে; অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে, তার আবেদন বোধের কাছে। কবিতা স্তবক-চরণ বাক্য বা শব্দ উচ্চারিত হলে উচ্চারণজনিত ধ্বনির মাধুর্য সরাসরি শ্রোতার কানকে তৃপ্ত করতে পারে, অথবা অর্থের সৌন্দর্য শ্রোতার বোধকে উদ্দীপিত করতে পারে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম, শব্দালংকার আর অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

আবার অলংকার শব্দের একটি ব্যাপক অর্থ আছে। অলংকারের দ্বারা রস, রীতি, ধ্বনি, গুণ, ক্রিয়া, অনুপ্রাস, উপমা, বক্রোক্তি প্রভৃতিকে বোঝায়। কারণ কাব্যসৌন্দর্য বলতে এই বৈশিষ্ট্যগুলিই গণনীয়। কিন্তু বিশিষ্ট অর্থে অলংকার বলতে শুধুই শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারকেই বোঝায়।

১৪.৪ সারাংশ

শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য গয়না দিয়ে শরীরকে সাজানো হয়। তাই, গয়না শরীরের অলংকার। তেমনি, কথাকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য যে আয়োজন, তা কথার অলংকার। আর, এই অলংকার দিয়ে সাজানো কথাই কাব্য বা কবিতা।

ভারতবর্ষে অলংকারের ইতিহাস ২১০০ বছরের। প্রথমে ভরতমুনি জানালেন ৪টি অলংকারের কথা, তারপর আচার্য দণ্ডী ৩৬টি এবং ভামহ, বামনাচার্যের যুগ পেরিয়ে সবশেষে বিশ্বনাথ কবিরাজ ৭৬টি অলংকারের আলোচনা করলেন। বামনাচার্যের একটি মত, অলংকার হচ্ছে কবিতার শরীরের সৌন্দর্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ এই অর্থ ধরেই অলংকার ব্যাখ্যা করলেন, আমরাও এই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান করব।

একটিমাত্র শব্দ অথবা একটি-দুটি চরণ বা একটি স্তবক, এমনকী একটি গোটা কবিতা জুড়েও থাকতে পারে অলংকার। কবিতা বা স্তবক-চরণ শব্দের দুটি রূপ—ধ্বনিরূপ আর অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম শব্দালংকার, অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালঙ্কার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

১৪.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. ভরতমুনির গ্রন্থের নাম কী ?

২. 'কাব্যালঙ্কার' কার গ্রন্থের নাম?

৩. 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্করাৎ' কথাটির প্রবক্তা কে?

৪. বিশ্বনাথ কবিরাজ কোন শতাব্দীর মানুষ?

৫. 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের রচয়িতার নাম লিখুন।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন:

১. কীভাবে অলংকার কাব্যকে চারুত্ব দান করে, বুঝিয়ে দিন।

২. কী কারণে অলংকারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ব্যাখ্যা করুন।

৩. শরীরের অলংকার আর কাব্যদেহের অলংকারের মূল পার্থক্য কোথায়?

একক ১৫: শব্দালংকার

একক গঠন:

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ ভূমিকা

১৫.৩ মূলপাঠ: শব্দালংকার

- ১৫.৩.১ অনুপ্রাস
    - ১৫.৩.১.১. সরল অনুপ্রাস
    - ১৫.৩.১.২. বৃত্ত্যনুপ্রাস
    - ১৫.৩.১.৩. ছেকানুপ্রাস
    - ১৫.৩.১.৪. শ্রুত্যনুপ্রাস
    - ১৫.৩.১.৫. আদ্যানুপ্রাস
    - ১৫.৩.১.৬. অন্ত্যানুপ্রাস
    - ১৫.৩.১.৭. সর্বানুপ্রাস
    - ১৫.৩.১.৮. মালানুপ্রাস
    - ১৫.৩.১.৯. গুচ্ছানুপ্রাস
- ১৫.৩.২ যমক
    - ১৫.৩.২.১ আদ্যযমক
    - ১৫.৩.২.২ মধ্যযমক
    - ১৫.৩.২.৩ অন্ত্যযমক
    - ১৫.৩.২.৪ সর্বযমক
- ১৫.৩.৩ শ্লেষ
    - ১৫.৩.৩.১ অভঙ্গ শ্লেষ
    - ১৫.৩.৩.২ সভঙ্গ শ্লেষ
- ১৫.৩.৪ বক্রোক্তি
    - ১৫.৩.৪.১. কাকু-বক্রোক্তি
    - ১৫.৩.৪.২. শ্লেষ-বক্রোক্তি

১৫.৪ সারাংশ

১৫.৫ অনুশীলনী

১৫.১ উদ্দেশ্য

মূল একক দুটির উদ্দেশ্য হল বাংলা কবিতার উচ্চারণে কবিরা ধ্বনিপ্রয়োগে বৈচিত্র্য আনয়ন করে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, তার পরিচয় নেওয়া।

দ্বিতীয়ত, কতভাবে এই ধ্বনিপ্রয়োগ-বৈচিত্র্য সৃজন করা হয়, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

তৃতীয়ত, ধীরে ধীরে কবিকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার রূপ নির্ণয়ে সক্ষমতা অর্জন করা।

১৫.২ ভূমিকা

শব্দ হল মূর্ত ধ্বনি বা ধ্বনি-সংকেত। শব্দের বহিরঙ্গের যে ধ্বনি তার ওপরেই শব্দালংকারের ভিত্তি। শব্দের ধ্বনিকে কেন্দ্র করে যে অলংকার গড়ে ওঠে তাকে বলে শব্দালংকার। শব্দালংকারের সব কাজই ধ্বনিকেন্দ্রিক। এই শ্রেণির অলংকারে শব্দকে বদল করা যায় না। কারণ, শব্দ পরিবর্তিত হলে তার ধ্বনিও পরিবর্তিত হবে এবং অলংকারও তার গতিপথ হারাবে।

বাংলায় 'শব্দ' কথাটির দুটি অর্থ— একটি ধ্বনি, অন্যটি অর্থবোধক বর্ণসমষ্টি (লেখায়) বা ধ্বনিসমষ্টি (উচ্চারণে)। প্রথমটি ইংরেজি Sound অর্থে, দ্বিতীয়টি ইংরেজি Word অর্থে। 'শব্দালংকার'-এর 'শব্দ' তাহলে কোন অর্থে? দুটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে অর্থটি বুঝে নেওয়া যাক।

প্রথম উদাহরণ, 'কর্ষিত কনক কান্তি কমনীয় কায়'— এই ছত্রটিতে পাঁচটি শব্দ (Word) আছে, আবার পাঁচটি ক-ধ্বনিও আছে। পাঁচটি পৃথক শব্দ, কিন্তু একই ক-ধ্বনি পাঁচবার। ছত্রটি উচ্চারণ করলে ক-ধ্বনিটিই পরপর পাঁচবার কানে মৃদু আঘাত দেয়, একই ধ্বনি বারে বারে আবৃত্ত হয়ে মাধুর্য সৃষ্টি করে, তৈরি হয় ধ্বনির অলংকার—শব্দালংকার। পৃথক পৃথক শব্দ (Word) এখানে কোনো অলংকার তৈরি করে না।

ওপরের উদাহরণটি থেকে বোঝা গেল, অলংকার তৈরি করে যে শব্দ তা Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি নয়, Sound বা ধ্বনি। অর্থাৎ, শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি। কিন্তু এ বিষয়ে একটু তর্ক আছে। আরও একটি উদাহরণ থেকে তর্কও উঠবে, সে তর্কের মীমাংসাও হবে।

শব্দালংকার ছয় প্রকার। অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি, ধন্যুক্তি এবং পুনরুক্তিবদাভাস। আমরা এখানে প্রথম চারটি মুখ্য শব্দালংকারের আলোচনা করব।

১৫.৩ মূল পাঠ: শব্দালংকার

১৫.৩.১ অনুপ্রাস:

সংজ্ঞা: একই ব্যঞ্জনধ্বনির বা সমব্যঞ্জনধ্বনির একাধিকবার উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের একাধিকবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণে, অথবা বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অনুপ্রাস অলংকার।

একটু অন্যভাবে বলা যায়— এক রকমের বর্ণ একটি বা একগুচ্ছ যখন বার বার ব্যবহৃত হয়ে যে শব্দ-সাম্যের সৃষ্টি করে—তখন তার নাম হয় অনুপ্রাস। 'অনু'-উপসর্গটি 'পরে বা পশ্চাতে'—এই রকম অর্থেই বসে থাকে। আর 'প্রাস' শব্দের অর্থ হল বিন্যাস, প্রয়োগ বা নিক্ষেপ। একই শব্দের পরে বা পশ্চাতে উক্ত শব্দের পুনর্বিন্যাস বা পুনঃপ্রয়োগের নামই অনুপ্রাস। এই প্রত্যয়গত অর্থকে মেজে ঘসে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের পরে ওই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের পুনঃপ্রয়োগের নাম অনুপ্রাস। যে বর্ণের অনুপ্রাস ঘটবে সেই বর্ণগুলি একটির থেকে অন্যটি ঘুর বেশি দূরে বিন্যস্ত হবে না। অদূরতা অনুপ্রাসের প্রধান লক্ষণ।

বৈশিষ্ট্য: ১। একই ব্যঞ্জনের দুবার বহুবার উচ্চারণ।

২। সমব্যঞ্জনের (জ-য, শ-ষ-স, ণ-ন) দু'বার বা বহুবার উচ্চারণ।

৩। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দু'বার যুক্ত (ন্ব-ন্ব, ন্ধ-ন্ধ) বা বিযুক্ত (শিষের-শিশির, শাখার-শিখরে) উচ্চারণ।

৪। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দু'বার বিযুক্ত (বরী-রবী, বাক্-কার্) উচ্চারণ।

৫। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণ।

৬। বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের দু'বার (ক-খ, চ-ছ, ট-ঠ) বা বহুবার (ত-থ-দ-ধ-ন) উচ্চারণ।

৭। স্বরধ্বনির সাম্য থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। একমাত্র প্রয়োগস্থানগত অনুপ্রাসে (আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস) স্বরধ্বনির সাম্য আবশ্যক।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ:

১. সরল অনুপ্রাস ২. বৃত্ত্যানুপ্রাস; ৩. ছেকানুপ্রাস; ৪. শ্রুত্যনুপ্রাস; ৫. আদ্যানুপ্রাস; ৬. অন্ত্যানুপ্রাস; ৭. সর্বানুপ্রাস; ৮. মালানুপ্রাস; ৯. গুচ্ছানুপ্রাস।

১৫.৩.১.১ সরল অনুপ্রাস

একটি বা দুটি বর্ণ (স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি) একাধিকবার ধ্বনিত হলেই এই অনুপ্রাস হয়। প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ—

ব্যাখ্যা (ক) ''কুটিল কুন্তল কুসুম কাছনি কান্তি কুবলয় ভাসয়ে।
কুঞ্চিতাধর কুসুম কৌমুদী কুন্দকোরক হাসয়ে।।
ক-ধ্বনির অনুপ্রাস। সঙ্গে উ-ধ্বনিরও অনুপ্রাস আছে।"

ব্যাখ্যা (খ) ''চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।
চ-, ল-, ক-ধ্বনির অনুপ্রাস। সঙ্গে র-, ণ-ধ্বনিরও অনুপ্রাস আছে।"

(গ) ''কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি।"

ব্যাখ্যা ক-ধ্বনির অনুপ্রাস। সঙ্গে এ-, শ-ধ্বনিরও অনুপ্রাস আছে।

১৫.৩.১.২ বৃত্ত্যানুপ্রাস:

সংজ্ঞা: একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণে বা ক্রম অনুসারে বহুবার (যুক্ত বা বিযুক্ত) উচ্চারণে বৃত্ত্যানুপ্রাস হয়।

১. একই ব্যঞ্জনের দু'বার উচ্চারণ—

''বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস''

ব্যাখ্যা: একই ব্যঞ্জনের 'ব' দুবার (বিদায়, বিষাদ) ধ্বনিত হওয়া বৃত্ত্যনুপ্রাস।

২. সমব্যঞ্জনের দু-বার উচ্চারণ—''জেগেছে যৌবন নব বসুধার দেহে।''

ব্যাখ্যা: সমব্যঞ্জন 'জ' 'য' দুবার উচ্চারিত হওয়ার বৃত্ত্যনুপ্রাস।

১৫.৩.১.৩ ছেকানুপ্রাস

সংজ্ঞা: একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত অথবা বিযুক্ত উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস হয়।

('ছেক' শব্দের অর্থ বিদগ্ধ পণ্ডিত। ছেকানুপ্রাস বিদগ্ধজনের প্রিয় অনুপ্রাস।)

দুটি বা ততোধিক ব্যঞ্জনগুচ্ছ যদি দু-বার মাত্র বাক্যে বসে—তবেই ছেকানুপ্রাস হয়। (দুবারের বেশি ধ্বনিত হলে অবশ্য তাকে আমরা গুচ্ছানুপ্রাস বলব।) 'ছেক' শব্দের অর্থ পণ্ডিত, আর পণ্ডিতেরাই পূর্বে এই জাতীয় অনুপ্রাস বেশি ব্যবহার করতেন বলেই এই অলংকারের এই নাম হয়েছে। আবার যেহেতু একই ক্রমে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি মাত্র একবার আবৃত্ত হয়—সেই জন্য একে অনেকে একানুপ্রাস বলেছেন।

উদাহরণ:

১. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত উচ্চারণ

(i) উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে।

ব্যাখ্যা: একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'ম্-ব্'-এর ক্রম অনুসারে যুক্ত উচ্চারণ (ম্ব) হয়েছে দুর্বার (কলম্ব, অম্বর)। অতএব, ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

(ii) কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।

সংকেত : 'ন্-ধ্'-এর যুক্ত উচ্চারণ (ন্ধ) দু'বার।

২. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)—একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।

ব্যাখ্যা: একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'শ-ষ-র'-এর ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে 'শিষের' ও 'শিশির' শব্দ দুটিতে। লক্ষণীয় এখানে স্বরসাম্য নেই (ই-এ, ই-ই)। তবু ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

মন্তব্য : 'শ-ষ-র' এবং 'শ-শ-র' ধ্বনিগতভাবে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ। 'শ-ষ'-এর বর্ণগত পার্থক্য থাকলেও বাংলা উচ্চারণে এরা একই রকম ধ্বনি। ধ্বনিদুটিকে সমব্যঞ্জন বলা যায়।

১৫.৩.১.৪ শ্রুত্যনুপ্রাস

সংজ্ঞা: বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে শ্রুত্যনুপ্রাস। (একই ধ্বনির অনুপ্রাস নয়, তবে একই স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি বলে তারা শ্রুতিতে বা শুনতে একইরকম। শ্রুতিতে অনুপ্রাস বলেই এর নাম শ্রুত্যনুপ্রাস।)

কণ্ঠ, তালু, দন্ত প্রভৃতি যে কোনো একস্থান থেকে উচ্চারিত অথচ ভিন্নবর্ণের সঙ্গে মধুর সাদৃশ্য ঘটে, তবেই শ্রুত্যনুপ্রাস হয়। যেমন—

(ক) ''যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে।''

(এখানে সন্ধ্যার 'ন্ধ' মন্দের ন্দ-এর সঙ্গে এবং 'ন্দ'-'ন্থ'র সঙ্গে অনুপ্রাসিত।

(খ) ''বর্ষায় দেখি শিখর শিখরী কি করি ভেবে
মেলে দেয় ডানা, নেচে ওঠে মহাখুশিতে হাসিতে বেগে।''

(এখানে 'শিখরী' আর 'কি করি' লক্ষ্য করলেই শ্রুত্যনুপ্রাস বোঝা যাবে।)

১. একই স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ব্যঞ্জনের দু'বার উচ্চারণ—

(i) ''বাতাস বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।''

ব্যাখ্যা: 'গ-ঘ' ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জন হলেও বাগযন্ত্রের একই স্থান কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত। ফলে, ওই দুটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও তারা অনায়াসে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে 'বেগে' আর 'মেঘে' শব্দদুটিতে। এ অনুপ্রাস। শ্রুতিগত বলে এটি শ্রুত্যনুপ্রাস।

(ii) ''চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।''

সংকেত: 'ক-খ' (কণ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস 'চিকন-লিখন' শব্দটিতে

১৫.৩.১.৫ আদ্যানুপ্রাস:

সংজ্ঞা: পদ্যে পরপর দুটি চরণের বা পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে আদ্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) ''বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই।''

সংকেত: চরণের আদিতে 'বড়ো'-জড়ো' শব্দে 'অড়ো' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে আদ্যানুপ্রাস।

(ii) নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত চরণের প্রথম পর্বের আদিতে 'নিত্য' এবং দ্বিতীয় পর্বের আদিতে 'চিত্ত—'এই দুটি

শব্দে 'ইত্ত' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 'ইত্ত' ধ্বনিগুচ্ছে আছে স্বরধ্বনি 'ই-অ' সমেত ব্যঞ্জনধ্বনি 'ত্ত' (ই-ত্-ত্-অ)। অতএব, এখানে আদ্যানুপ্রাস হয়েছে।

১৫.৩.১.৬ অন্ত্যানুপ্রাস:

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের শেষে, পদের শেষে, পর্বের শেষে, এমনকী পঙ্‌ক্তির (line) শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অন্ত্যানুপ্রাস ঘটে।

অন্যভাবে বলি, কবিতার চরণের শেষে যে মিল, তাকেই অন্ত্যানুপ্রাস বলে। অন্ত্যানুপ্রাস কাব্যের উৎকর্ষ বাড়ায় এবং চমৎকারিত্ব দান করে। দু'এক জায়গায় অভাবিতপূর্ব মিল দিয়ে কবি পাঠককুলকে মুগ্ধ করেন। নীচে কয়েকটি অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ দেওয়া হল—

উদাহরণ:

(i) অজানু গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি।

ব্যাখ্যা: এ উদাহরণে প্রথম চরণটি সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় চরণ অপূর্ণ। প্রথম চরণের শেষে 'চমকি' আর দ্বিতীয় চরণের শেষে 'থমকি'—এই দুটি শব্দে 'অমকি' ধ্বনিগুচ্ছের (অ-ম্-অ-ক্-ই) অন্তর্গত তিনটি স্বরধ্বনিসমেত 'ম্-ক্' ব্যঞ্জনগুচ্ছ পুনরাবৃত্ত হয়ে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

১৫.৩.১.৭ সর্বানুপ্রাস:

সংজ্ঞা : পদ্যে দুটি চরণের সর্বশরীরে (প্রতিটি শব্দে) অনুপ্রাস থাকলে, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রতিটি শব্দের কোনো ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে দ্বিতীয় চরণের প্রতিটি শব্দে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে সর্বানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) ''গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।''

ব্যাখ্যা: এখানে প্রতিটি চরণে তিনটি করে শব্দ। প্রথম শব্দযুগল 'গগন-চরণে', দ্বিতীয় শব্দযুগল 'ছড়ায়ে জড়ায়ে' এবং তৃতীয় শব্দযুগদল 'এলোচুল-বনফুল'—এই তিনটি শব্দযুগলে যথাক্রমে 'অঅনে', 'অড়ায়ে' এবং 'উল' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এভাবে সর্বানুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

(i) ''সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা।''

সংকেত: 'অন্ধ্যা', 'উকের', 'ঔরবী', 'আশা' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি।

১৫.৩.১.৮ মালানুপ্রাস:

অনুপ্রাসের মালা অর্থাৎ একাধিক অনুপ্রাস যখন বাক্যে থাকে—তখন সেখানে মালানুপ্রাস রয়েছে

বলা হয়। আসলে পর পর অনুপ্রাস সাজিয়েই এই মালা রচনা করা হয় বলে একে অনেকেই সেজন্যে অনুপ্রাসের স্বতন্ত্র শ্রেণি বলে স্বীকার করেননি। যেমন— 'শিশির কণায় মাণিক ঘনায়, দূর্বাদলে দ্বীপ জ্বলে।" এখানে প্রথমে 'ণ'-এর অনুপ্রাস, এবং তার পরেই দ-এর অনুপ্রাস; পর পর এই দুটি অনুপ্রাস নিয়েই মালা গাঁথা হয়েছে।

এই রকমের অন্য কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো—

(ক) ''ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত।"

('ন' এর পরেই 'শ'-এর অনুপ্রাস হয়েছে।)

(খ) ''দেশ দেশ দিশি দিশি দৌড়িছে দিবা নিশি
অগণিত সিত পীত কৃষ্ণ।
কত কারখানা কল-কব্জার কল-কল
কলঝঙ্কৃত কালো অঙ্গ।
ইঞ্জিন-গুঞ্জন পুঞ্জিত বিদ্যুতে
চঞ্চল নয়নে ভূভঙ্গ।"

(আগে দ-এর, পরে ত-এর, তৎপরে ক-এর এবং শেষে 'এ'-এর অনুপ্রাস হয়েছে।)

১৫.৩.১.৯ গুচ্ছানুপ্রাস:

একের বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত হয়—তখনই সৃষ্টি হয় গুচ্ছানুপ্রাস। যেমন—

''এত ছলনা কেন বলনা
গোপ-ললনা হ'ল সারা।"

এখানে 'লনা' এই ব্যঞ্জনধ্বনি একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত হওয়ায় গুচ্ছানুপ্রাস হয়েছে।

নীচে আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

(ক) ''না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত।"

(খ) ''কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, দবলী চরাই বনে।"

১৫.৩.২ যমক

সংজ্ঞা: একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম যমক অলংকার। ধ্বনিগুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে একাধিক ব্যবহারের নাম যমক।

যমক শব্দের অর্থ হলো যুগ্ম। একই শব্দ বা প্রায় একরকমের উচ্চার্য শব্দ যদি দুবার কি তার বেশিবার আলাদা আলাদা অর্থে বসে—তবে যমক অলংকার হয়। ''যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া,

খুঁজে ফিরি সারা দেশটা"—রবীন্দ্রনাথের এক পঙ্‌ক্তিতে 'সাড়া' এবং 'সারা' ভিন্ন অর্থে বসেছে। যদিও 'ড়' এবং 'র' এক বর্ণ নয়, তবু ধ্বনিগত সাদৃশ্যের জন্যে এদের মধ্যে যমক হয়েছে বলতে হবে।

বৈশিষ্ট্য: ১। ধ্বনিগুচ্ছে স্বরধ্বনি থাকবে, ব্যঞ্জনধ্বনিও থাকবে।

২। বাংলায় সমধ্বনির (ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, শ-ষ-স) উচ্চারণে পার্থক্য নেই। অতএব যমকে সমধ্বনির প্রয়োগ হতে পারে।

৩। ধ্বনির পরিবর্তন হলে যমক থাকবে না, অনুপ্রাস হয়ে যেতে পারে।

৪। ধ্বনিগুচ্ছের একাধিক উচ্চারণ হবে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে। বিন্যাস ক্রমের পরিবর্তন হলে যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে।

৫। ধ্বনিগুচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিক উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চারণেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অর্থযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছের নাম শব্দ। অতএব এটি হবে একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ, কিন্তু একই অর্থে নয়। এর নাম সার্থক যমক।

৬। ধ্বনিগুচ্ছের সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিক উচ্চারণ হতে পারে। এর অর্থ, ধ্বনিগুচ্ছের একবার সার্থক বা অর্থযুক্ত উচ্চারণ, অন্যবার নিরর্থক বা অর্থহীন উচ্চারণ। অর্থাৎ, একবার শব্দের উচ্চারণ, অন্যবার শব্দাংশের উচ্চারণ। এর নাম নিরর্থক যমক।

৭। ৫ম-৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা গেল, ধ্বনিগুচ্ছের একটি প্রয়োগ অর্থযুক্ত হবেই, অন্যপ্রয়োগ অর্থযুক্ত বা অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি প্রয়োগেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থহীন হতে পারে না, হলে তা যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন 'সৌরভ-রভসে"। এখানে 'রভ' ধ্বনিগুচ্ছ দু'বারই উচ্চারিত হয়েছে নিরর্থক শব্দাংশ হিসেবে। অতএব এটি যমক নয় অনুপ্রাস।

এরকম আরও ক'টি উদাহরণ—

(ক) ''ডাকে প্রভাকর-কর, ওহে প্রভাকর-কর
প্রভাকর করের কি ভাব।"

(প্রভাকর-কর হচ্ছেন প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দ্বিতীয় প্রভাকর করের অর্থ সূর্য-স্রষ্টা ঈশ্বর।)

(খ) ''যা নাই ভারতে (মহাভারতে) তা নাই ভারতে (ভারতবর্ষে)।"

(গ) ''মনে করি করী করি, কিন্তু হয় হয়, হয় না।" (মনে করি হাতি তৈরি করি, কিন্তু ঘোড়া হয়, হাতি হয় না।)

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ:

প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের (ক) সার্থক যমক ; (খ) নিরর্থক যমক। প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের যথা— ১. আদ্যযমক; ২. মধ্যযমক; ৩. অন্ত্যযমক; ৪. সর্বযমক।

বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

(ক) সার্থক যমক:

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারের একই বা সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার নাম সার্থক যমক।

উদাহরণ: ১. একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) ‘‘কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার।’’

ব্যাখ্যা: একই শব্দ ‘কীর্তিবাস’ দুবার উচ্চারিত। প্রথম ‘কীর্তিবাস’ এখানে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস অর্থে ভুল বানানে লেখা, দ্বিতীয় ‘কীর্তিবাস’ অর্থ কীর্তির বসতি যেখানে। অতএব, এটি সার্থক যমক।

(খ) নিরর্থক যমক:

সংজ্ঞা: যে যমক অলংকারে একই ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ হয়, তার নাম নিরর্থক যমক।

উদাহরণ:

(i) ‘‘যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।’’

ব্যাখ্যা: ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘বন’ প্রথমে উচ্চারিত হয়েছে ‘যৌবন’ শব্দের অংশ হিসেবে। এখানে তার উচ্চারণ অর্থহীন বা নিরর্থক। ঐ ‘বন’ পরে উচ্চারিত হল একটি পূর্ণশব্দের মর্যাদা নিয়ে, যখন তার অর্থ হল ‘অরণ্য। এখানে তার উচ্চারণ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অতএব, এ উদাহরণ নিরর্থক যমকের।

(ii) ‘‘বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।’’

ব্যাখ্যা: ‘রবি’ ধ্বনিগুচ্ছ ‘পূরবী’ শব্দের অংশ, অতএব নিরর্থক। ‘রবি’ স্বতন্ত্র শব্দ, অতএব সার্থক। ‘রবী : আর ‘রবি’ মূলত একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ (র-ব), সমস্বরধ্বনি, ‘ঈ’ আর ‘ই’-র সহযোগে তাদের গঠন। এই দুটি ধ্বনিগুচ্ছের একই উচ্চারণ। সুতরাং, এটি নিরর্থক যমক।

১৫.৩.২.১ আদ্যযমক:

সংজ্ঞা: পদ্যে চরণের আদিতে যমক থাকলে তার নাম আদ্যযমক।

উদাহরণ:

(i) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।

ব্যাখ্যা: ‘ভারত’ শব্দটির প্রথম প্রয়োগে ‘কবি ভারতচন্দ্র রায়’ অর্থে, দ্বিতীয় প্রয়োগ ‘ভারতবর্ষ’ অর্থে। অতএব এটি সার্থক যমক। যমকটি হয়েছে উদ্ধৃত চরণের আদিতে। অতএব, এটি আদ্যযমক।

১৫.৩.২.২ মধ্যযমক:

সংজ্ঞা: পদ্যে চরণের মাঝখানে যমক থাকলে তার নাম মধ্যযমক।

উদাহরণ:

(i) ‘‘পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা।’’

ব্যাখ্যা: প্রথম 'তরি' অর্থ নৌকা, দ্বিতীয় 'তরি' অর্থ পার হাই। এটি সার্থক যমক। যমকটি চরণের মাঝখানে রয়েছে। অতএব, এটি মধ্যযমকের উদাহরণ।

১৫.৩.২.৩ অন্ত্যযমক:

সংজ্ঞা: পদ্যে একটি পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে, যমক থাকলে তার নাম অন্ত্যযমক।

উদাহরণ: ''মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয় হয় না।''

ব্যাখ্যা: একই শব্দ 'হয়' চরণের শেষে দুবার উচ্চারিত দুটি ভিন্ন অর্থে—প্রথম অর্থ ঘোড়া, দ্বিতীয় অর্থ হয়ে যায়। অতএব এটি সার্থক যমক, এবং চরণের শেষে রয়েছে বলে অন্ত্যযমক।

১৫.৩.২.৪ সর্বযমক:

সংজ্ঞা: একটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পরের চরণে আর একবার করে উচ্চারিত হলে অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ চরণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারিত হলে যে বাক্যগত শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সর্বযমক।

উদাহরণ:

''কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে।।''

ব্যাখ্যা: প্রথম চরণে 'কান্তার' অর্থ বনভূমি, 'আমোদ' অর্থ সৌরভ, 'কান্ত' অর্থ বসন্তকাল আর 'সহকারে' অর্থ সমাগমে। দ্বিতীয় চরণে 'কান্তার' অর্থ প্রিয়তমার 'আমোদ' অর্থ আনন্দ, 'কান্ত' অর্থ প্রিয়তম, 'সহকারে' অর্থ সঙ্গে। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারণে প্রতিটি শব্দেই একটি করে সার্থক যমক হয়েছে। আবার সামগ্রিকভাবে প্রথম চরণের অর্থ— বনভূমি বসন্তসমাগমে সৌরভপূর্ণ, দ্বিতীয় চরণের অর্থ— প্রিয়তমের সঙ্গলাভে প্রিয়তমার আনন্দ সম্পূর্ণ। অতএব, এটি বাক্যগত সার্থক যমক এবং সর্বযমক।

১৫.৩.৩ শব্দশ্লেষ

সংজ্ঞ: একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম শ্লেষ (শব্দশ্লেষ) অলঙ্কার। (একটি শব্দের একবার ব্যবহারে একাধিক অর্থ বোঝালে শ্লেষ।)

একটি শব্দ যখন একের বেশি অর্থে একবার বাক্যে বসে—তখনই শ্লেষ অলংকার হয়। বাক্যে শব্দ একবার মাত্র বসবে, কিন্তু একাধিক অর্থ প্রকাশ করবে, বক্তা এই একাধিক অর্থ প্রকাশ করতেই ইচ্ছুক থাকবেন, নচেৎ শ্লেষ হবে না। বক্তা এমন একাধিক শব্দ ব্যবহার করলেন—যার একটি বিশিষ্ট অর্থ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বলেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শ্রোতা তার অন্য অর্থ খুঁজে বের করে শব্দটিকে অন্য রকমে বুঝেছেন তেমন ক্ষেত্রে শ্লেষ হয় না।

শব্দের দুটি অর্থ হবে ঠিকই, কিন্তু শব্দকে অক্ষত বা অবিকৃত থাকতে হবে, সেই জন্যে শব্দের যে ধ্বনি—তা নিত্য হয়ে প্রাধান্য লাভ করছে; সুতরাং যমকের মতো শ্লেষও নিঃসন্দেহে শব্দালংকার।

বৈশিষ্ট্য:

১। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

২। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ—

(ক) ''আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।

আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে।।"

এখানে 'গুণ' শব্দটি একবার মাত্র উল্লিখিত, কিন্তু দুটি অর্থ প্রকাশ করছে, একটি হলো ধনুকের ছিলা এবং অন্যটি—চারিত্রিক গুণ বা উৎকর্ষ।

(খ) ''বুদ্ধের মতন যার আনন্দ সে নিত্য সহচর।"

বুদ্ধদেবের যেমন আনন্দ নামে জনৈক শিষ্য সর্বদা বুদ্ধদেবের সঙ্গে থাকতেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের জীবনে আনন্দ নিত্য সহচর ছিল। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে আনন্দ শিষ্যের নাম, রবীন্দ্রনাথের হলো উচ্চজাতের সুখ।

(গ) ''কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

কবি ঈশ্বর গুপ্ত লুকিয়ে নেই, তিনি সর্বত্রই আছেন, তাঁর জন্যেই সংবাদপত্র প্রভাকর প্রকাশিত হচ্ছে। আর অন্য অর্থও সূচিত হচ্ছে—ভগবান গুপ্ত নেই, তিনি সর্বত্র বিরাজিত, তাঁর তেজেই প্রভাকর সূর্য দীপ্তিমান হচ্ছে।

প্রকারভেদ—

বাংলায় শ্লেষ বলতে শব্দ শ্লেষকেই বোঝায়। এই শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ দু-রকমের—

১. অভঙ্গ শ্লেষ ২. সভঙ্গ শ্লেষ।

সংজ্ঞা উদাহরণ ব্যাখ্যা—

১৫.৩.৩.১ অভঙ্গ শেষ

সংজ্ঞা: যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম অভঙ্গ শেষ। শব্দকে ভঙ্গ না করে যখন দুটি অর্থে তাকে প্রয়োগ করা হয়—তখন শব্দের অভঙ্গ শ্লেষ হয়। আগের উদাহরণগুলি লক্ষ করলেই তা বোঝা যাবে। ''এনেছে তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে''—এখানে 'গুণে' শব্দটিকে যথাযথ রেখে দিয়েই আমরা 'স্বভাবের মাধুর্য বা উৎকর্ষ' এবং 'ধনুকের ছিলা' বুঝছি, 'গুণ' শব্দটিকে ভাঙতে হচ্ছে না—তাই এখানে অভঙ্গ শ্লেষ হয়েছে।

উদাহরণ:

(ক) ''মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে।''

ব্যাখ্যা : 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই চরণটিতে বিদায়-মুহূর্তে কবি মধুসূদন মাতৃভূমির কাছে বিস্মৃত হবার যে আবেদন রাখছেন, সেই প্রসঙ্গে 'মধু' শব্দটিকে দুটি অর্থে তিনি প্রয়োগ করছেন। প্রথম অর্থ 'কবি মধুসূদন দত্ত', দ্বিতীয় অর্থ 'মউ'। একটি প্রয়োগে শব্দটিকে না ভেঙেই দুটি অর্থ পাওয়া গেল। অতএব, এটি অভঙ্গ শ্লেষ।

১৫.৩.৩.২ সভঙ্গ শ্লেষ:

সংজ্ঞা: যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম সভঙ্গ শ্লেষ।

বাংলা ভাষায় সভঙ্গ শ্লেষের চল নেই। তবু দু'একটা চলতি উদাহরণ আছে—

(ক) ''জগৎটা কার বশ?'' (জগৎ টাকার বশ!)।

(এখানে 'টাকার' শব্দকে ভেঙে 'টা' এবং 'কার'—এই দুটি ভাগ করা হয়েছে, জগতের সঙ্গে 'টা' যুক্ত করে প্রশ্নসূচক বাক্যের এক মানে, আবার টাকার শব্দকে একত্রে রেখে জগৎ শব্দ থেকে বিচ্যুত করে নিলে বাক্যটি উত্তর সূচক হয়ে দাঁড়াবে। টাকার শব্দটিকে ভঙ্গ করা হলো বলেই দুটি অর্থ পাওয়া গেল, তাই এখানে সভঙ্গ শ্লেষ হয়েছে বলতে হবে।)

আরও উদাহরণ —

(i) ''আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মুলতানে
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন, ভুলে যাবে তার মানে।''

ব্যাখ্যা: 'রোগশয্যায়' কাব্য থেকে উদ্ধৃত অংশের প্রথম চরণে 'মুলতান' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন দুটি অর্থে। প্রথম অর্থ 'সূর্যাস্তকালীন রাগিণীবিশেষ'এটি অখণ্ড 'মুলতান' শব্দেরই অর্থ। 'মূলতান' শব্দটিকে 'মূল' আর 'তান' এই দুটি অংশে ভাঙলে যে অর্থটি মেলে তা এই—'বিশ্ববীণার মূল বা উৎস-তন্ত্রীতে আনন্দের যে তান বা সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে।' প্রথমে না ভেঙে একটি অর্থ, পরে ভেঙে আর-একটি অর্থ 'মুলতান' শব্দটি থেকে পাওয়া গেল। অতএব, এটি সভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

১৫.৩.৪ বক্রোক্তি:

সংজ্ঞা: যেখানে বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে বাঁকাভাবে অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বলা হয়, অথবা বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেখানে কণ্ঠভঙ্গি অথবা শ্লেষের কারণে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়। এর নাম বক্রোক্তি অলংকার। বা কোনো কথা ঘুরিয়ে বললে অথবা শ্রোতা কথাটির সহজ অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য অর্থ ধরলেই বক্রোক্তি।

এক অর্থে ব্যবহার করা শব্দকে যদি প্রশ্ন বা স্বর-বিকৃতির দ্বারা অন্য অর্থে সংযোজন করে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলেই বক্রোক্তি অলংকার হয়।

বৈশিষ্ট্য:

১। বক্রোক্তি' (বক্র + উক্তি) অর্থ বাঁকা কথা। কথায় সৌন্দর্য ফোটানোর লক্ষেই এ বক্রতা আবশ্যক। উক্তির এই বক্রতা সৃষ্টির জন্য কবিরা দুটি কৌশল প্রয়োগ করেন—একটি 'কাকু' বা কন্ঠভঙ্গি, আর একটি 'শ্লেষ' বা দ্ব্যর্থকতা (কথাটির দুটি অর্থ)।

২। বক্রোক্তির প্রথম লক্ষণ বক্তার তরফে বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে বলা। 'কাকু' বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যেই কথায় বক্রতা আনা যেতে পারে। ভঙ্গিটা যদি এমন হয় যে, হাঁ-প্রশ্নবাক্য দিয়ে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্য দিয়ে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তাহলে হবে কাকু-বক্রোক্তি।

৩। বক্রোক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ, শ্রোতার তরফে বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, বক্তা যে কথাটির প্রয়োগ করেছেন তার দুটি অর্থ— একটি বক্তার অভিপ্রেত অর্থ, অন্যটি শ্রোতার গৃহীত অর্থ। অতএব, কথাটির প্রয়োগে শ্লেষ আছে। দেখা যায়, শ্লেষের সুযোগ নিয়ে শ্রোতা প্রতিবারই কথাটিকে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের দিকে টেনে নিচ্ছেন, অভিপ্রেত অর্থটি বারে বারে উপেক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে বক্তা এবং শ্রোতার উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্য তৈরি হতে থাকে। এরই নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

প্রকারভেদ

বক্রোক্তি দু-রকমের—১. কাকু-বক্রোক্তি; ২. শ্লেষ বক্রোক্তি।

১৫.৩.৪.১ কাকু-বক্রোক্তি

সংজ্ঞা: যে বক্রোক্তি অলংকারে কাকু বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির হাঁ-প্রশ্নবোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তার নাম কাকু-বক্রোক্তি।

উদাহরণ:

(i) ''রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?''

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদকাব্য' থেকে উদ্ধৃত এই চরণদুটি হাঁ-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত। এর উত্তরে শ্রোতাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, প্রমীলা ভিখারি রাঘবকে একটু ভয় করে না। উপলব্ধিটি না-বোধক। বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত না-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পেল বলে এখানে কাকু-বক্রোক্তি হয়েছে।

(ii) ''মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?''

ব্যাখ্যা: 'গান্ধারীর আবেদন' থেকে উদ্ধৃত গান্ধারীর এই উক্তি না-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত ('নহি' 'বহি নাই')। স্নেহ-দুর্বল ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর বক্তব্য—তিনিও মা, দুর্যোধনকে গর্ভে বহন করার দুঃখ তিনি বরণ করেছেন। বক্তব্যবটি হাঁ-বোধক। কিন্তু এটি প্রকাশ পেল বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত না-প্রশ্নবাক্য থেকে। অতএব অলংকার এখানে কাকু-বক্রোক্তি।

এই রকম আরও দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(ক) কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?

(খ) কে না জানে অলংকারে অঙ্গনা বিলাসী?

(গ) গ্রহ দোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী?

(ঘ) ফোটে কি কমল কভু কমল সলিলে?

১৫.৩.৪.২ শ্লেষ-বক্রোক্তি

সংজ্ঞা: যে বক্রোক্তি অলংকারে বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে এবং শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অন্য অনভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ করেন, তার নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

উদাহরণ:

"বক্তা—দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন?"

"শ্রোতা—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।"

"বক্তা—বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয়?"

"শ্রোতা—সুরে না সেবিলে বল মুক্তি কিসে হয়?"

ব্যাখ্যা: বক্তার প্রথম কথায় 'দ্বিজ' এবং 'বারুণী' শব্দের দুটি করে অর্থ। 'দ্বিজ' শব্দের একটি অর্থ ব্রাহ্মণ এবং 'বারুণী'-র একটি অর্থ মদ। অতএব বক্তার অভিপ্রেত অর্থ—ব্রাহ্মণ হয়ে মদ খাও কেন? 'দ্বিজ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ চাঁদ, 'বারুণীর'-র অর্থ পশ্চিমদিক। শ্রোতার গৃহীত অর্থটি এইরকম—চাঁদ পশ্চিমদিকে যাচ্ছে কেন? এই অর্থ ধরেই তার উত্তর—সূর্য উঠছে তাই চাঁদ ডুবছে। এটি বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ। এইভাবে শ্রোতা শ্লেষের সুযোগে বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অনভিপ্রেত অন্য অর্থটি গ্রহণ করায় শ্লেষ-বক্রোক্তি হয়েছে।

বক্তার দ্বিতীয় বাক্যেও একইভাবে 'সুরাসক্ত' শব্দটিকে কেন্দ্র করে বক্রোক্তি হয়েছে। 'সুরাসক্ত' থেকে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ 'সুরায় আসক্ত' বা মদখোর (সুরা + আসক্ত), কিন্তু শ্রোতার গৃহীত অর্থ 'সুরে আসক্ত' বা দেবভক্ত (সুর + আসক্ত)। বক্তার এই অনভিপ্রেত অর্থটি ধরেই শ্রোতার উত্তর দেবসেবা ছাড়া মুক্তি নেই। অতএব, এখানেও শ্লেষ-বক্রোক্তি।

১৫.৪ সারাংশ

শব্দ হল মূর্ত ধ্বনি বা ধ্বনি-সংকেত। শব্দের বহিরঙ্গের যে ধ্বনি তার ওপরেই শব্দালংকারের ভিত্তি। শব্দের ধ্বনিকে কেন্দ্র করে যে অলংকার গড়ে ওঠে তাকে বলে শব্দালংকার। শব্দালংকার ছয় প্রকার। অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি, ধন্যুক্তি এবং পুনরুক্তিবদাভাস।

অনুপ্রাস— একই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের একাধিকবার উচ্চারণে অনুপ্রাস হয়। **প্রকারভেদ**—১. সরল অনুপ্রাস ২. বৃত্ত্যনুপ্রাস; ৩. ছেকানুপ্রাস; ৪. শ্রুত্যনুপ্রাস; ৫. আদ্যানুপ্রাস; ৬. অন্ত্যানুপ্রাস; ৭. সর্বানুপ্রাস; ৮. মালানুপ্রাস; ৯. গুচ্ছানুপ্রাস। **সরল অনুপ্রাস** একটি বা দুটি বর্ণ (স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি) একাধিকবার ধ্বনিত হলেই এই সরল অনুপ্রাস হয়। **বৃত্ত্যনুপ্রাস**—একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণে বা ক্রম অনুসারে বহুবার (যুক্ত বা বিযুক্ত) উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস। **ছেকানুপ্রাস**—একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দু'বার যুক্ত অথবা বিযুক্ত উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস। **শ্রুত্যনুপ্রাস**—বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে শ্রুত্যনুপ্রাস। **আদ্যানুপ্রাস**—পদ্যে পরপর দুটি চরণের বা পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে আদ্যানুপ্রাস। **অন্ত্যানুপ্রাস**—পদ্যে পরপর দুটি চরণের শেষে, পদের শেষে, পর্বের শেষে, এমনকী পঙ্‌ক্তির (line) শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অন্ত্যানুপ্রাস। **সর্বানুপ্রাস**—পদ্যে দুটি চরণের সর্বশরীরে (প্রতিটি শব্দে) অনুপ্রাস থাকলে, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রতিটি শব্দের কোনো ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে দ্বিতীয় চরণের প্রতিটি শব্দে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে সর্বানুপ্রাস। **মালানুপ্রাস**—অনুপ্রাসের মালা অর্থাৎ একাধিক অনুপ্রাস যখন বাক্যে থাকে—তখন সেখানে মালানুপ্রাস রয়েছে বলা হয়। **গুচ্ছানুপ্রাস**—একের বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত হয়—তখনই হয় গুচ্ছানুপ্রাস।

যমক— একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম যমক অলংকার। ধ্বনিগুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে একাধিক ব্যবহারের নাম যমক। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের—(ক) সার্থক যমক; (খ) নিরর্থক যমক। প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের— ১. আদ্যযমক; ২. মধ্যযমক; ৩. অন্ত্যযমক; ৪. সর্বযমক। যে যমক অলংকারের একই বা সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার নাম **সার্থক যমক**। যে যমক অলংকারে একই ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ হয়, তার নাম **নিরর্থক যমক**। **আদ্যযমক**—পদ্যে চরণের আদিতে যমক থাকলে তার নাম আদ্যযমক। **মধ্যযমক**—পদ্যে চরণের মাঝখানে যমক থাকলে তার নাম মধ্যযমক। **অন্ত্যযমক**—পদ্যে একটি পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে, যমক থাকলে তার নাম অন্ত্যযমক। **সর্বযমক**—এটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পরের চরণে আর একবার করে উচ্চারিত হলে তার নাম সর্বযমক।

শব্দশ্লেষ— একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম শ্লেষ অলঙ্কার। **প্রকারভেদ**— এই শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ দু-রকমের ১. অভঙ্গ শ্লেষ ২. সভঙ্গ শ্লেষ। **অভঙ্গ শ্লেষ**— যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম অভঙ্গ শ্লেষ। **সভঙ্গ শ্লেষ**— যে যে অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম সভঙ্গ শ্লেষ।

বক্রোক্তি— বক্তা কোনো কথা ঘুরিয়ে বললে অথবা শ্রোতা কথাটির সহজ অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য অর্থ ধরলেই বক্রোক্তি হয়। বক্রোক্তি দু-রকমের ১. কাকু-বক্রোক্তি; ২. শ্লেষ-বক্রোক্তি। **কাকু-বক্রোক্তি**—যে বক্রোক্তি অলংকারে কাকু বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির হাঁ-প্রশ্নবোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তার নাম কাকু-বক্রোক্তি। **শ্লেষ-বক্রোক্তি**—যে বক্রোক্তি অলংকারে বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে এবং শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অন্য অনভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ করেন, তার নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

১৫.৫ অনুশীলনী

১. শব্দালংকার বলতে কী বোঝায়, সংক্ষেপে লিখুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার, অর্থের অলংকার নয়।

৩. প্রধান চারটি শব্দালংকারের নাম এবং তাদের বিভাগগুলির নাম উল্লেখ করুন।

৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—ছেকানুপ্রাস, নিরর্থক যমক, অভঙ্গ শ্লেষ, কাকু-বক্রোক্তি।

৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) ''পৃথিবীটা কার বশ!''

(খ) ''ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।''

(গ) ''ধরি তার কর দুটি আদেশ পাইলে উঠি।''

(ঘ) ''লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।''

(ঙ) ''কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি।''

(চ) ''মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয় হয় না।''

(ছ) ''না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত।''

(জ) ''কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, দবলী চরাই বনে।''

(ঝ) ''নন্দ নন্দন চন্দন গন্ধ বিনিন্দিত অঙ্গ।''

(ঞ) ''গত যামিনী জিত দামিনী কামিনী কুল লাজে।''

৬. অনুপ্রাস অলঙ্কার কাকে বলে? এর বিভাগগুলি আলোচনা করুন।

৭. সঠিক অলংকার কোনটি, লিখুন—

(ক) ''কবির বুকের দুখের কাব্য—'' ছেকানুপ্রাস না বৃত্ত্যনুপ্রাস?

(খ) ''আর কি শুধু আসার আশায় থাকি—'' যমক না ছেকানুপ্রাস?

(গ) ''একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু—'' যমক না ছেকানুপ্রাস?

একক ১৬: অর্থালংকার

একক গঠন:

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ ভূমিকা

১৬.৩ শব্দালংকার আর অর্থালংকারের পার্থক্য

১৬.৪ মূলপাঠ: সাদৃশ্যমূলক অলংকার

১৬.৪.১ উপমা

১৬.৪.১.১ পূর্ণোপমা

১৬.৪.১.২ লুপ্তোপমা

১৬.৪.১.৩ মালোপমা

১৬.৪.১.৪ স্মরণোপমা

১৬.৪.১.৫ মহোপমা

১৬.৪.২ রূপক

১৬.৪.২.১ নিরঙ্গরূপক

১৬.৪.২.১.১ কেবল নিরঙ্গরূপক

১৬.৪.২.১.২ মালা নিরঙ্গরূপক

১৬.৪.২.২ সাঙ্গরূপক

১৬.৪.২.৩ পরম্পরিত রূপক

১৬.৪.২.৪ অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক

১৬.৪.৩ উৎপ্রেক্ষা

১৬.৪.৩.১ বাচ্যোৎপ্রেক্ষা

১৬.৪.৩.২ প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

১৬.৪.৪ অপহ্নুতি

১৬.৪.৫ সমাসোক্তি

১৬.৪.৬ অতিশয়োক্তি

১৬.৪.৭ ব্যতিরেক

১৬.৪.৭.১ উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক
১৬.৪.৭.২ অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক
১৬.৭ সারাংশ
১৬.৮ অনুশীলনী

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল শব্দের ধ্বনিরূপকে অতিক্রম করে কীভাবে শব্দের অর্থগৌরব বড় হয়ে ওঠে সেটি দেখানো। সেই সঙ্গে কবিতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করতে শব্দার্থ কীভাবে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, তা উল্লেখ করা। শিক্ষার্থীর কাছে ধরা দেবে কবির শব্দার্থের প্রয়োগগত কৌশল। নিরন্তর চর্চায় শিক্ষার্থী এ বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে উঠবে এটিই প্রত্যাশা।

১৬.২ ভূমিকা

অর্থালংকারে বাইরের রূপটি বড় নয়। শব্দের ধ্বনিগত উজ্জ্বলতায় এই অলংকার নিরূপিত হয় না। অর্থালংকার শব্দের রূপ থেকে অরূপের দিকে চলে। বাচ্যকে অতিক্রম করে বাচ্যাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করে। স্তবক বা তার অন্তর্গত চরণ বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাহলে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। 'অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে' বলতে এই বোঝায়, বাক্য বা শব্দের অর্থ অক্ষত রেখে শব্দ বদল করে দিলেও অলংকার যা ছিল, তাই থাকবে। কিন্তু শব্দ বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থটিও যদি বদলে যায়, তাহলে অলংকারটি আর টিকবে না। যে অলংকার অর্থের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকেই অর্থালংকার বলে। এই জাতের অলংকারে একটি শব্দকে যদি সরিয়ে রেখে তার প্রতিশব্দ বসানো যায়, তবুও অলংকারের সৌন্দর্যনাশ হয় না। তাই একে অর্থালংকার বলে।

১৬.৩ শব্দালংকার আর অর্থালংকারের পার্থক্য

১. শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, অর্থালংকার অর্থের অলংকার— প্রথমটি ধ্বনির মাধুর্য, দ্বিতীয়টি অর্থের সৌন্দর্য।

২. শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে, অর্থালংকারের আবেদন বোধের কাছে।

৩. শব্দালংকার শব্দের বদল সহ্য করে না, শব্দবদলে এর অপমৃত্যু। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে; শব্দ-অর্থ দুই-ই বদলে গেলে অর্থালংকারেরও অপমৃত্যু।

সংস্কৃত কাব্যে যেসব অর্থালংকারের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সংখ্যা অনেক। বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ তুলনায় অনেকটা সীমিত। অনেক রকমের অর্থালংকার আছে। তবু ওদের সাধারণ লক্ষণ দেখে যদি শ্রেণিবিভাগ করা যায় তবে পাঁচটা শ্রেণিতে ওদের ফেলতে হবে। যথা— সাদৃশ্যমূল, বিরোধমূল, শৃঙ্খলামূল, ন্যায়মূল আর গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূল অলংকার। নামগুলি সংস্কৃত আলংকারিকদের দেওয়া।

আমরা প্রথমে সাদৃশ্যমূলক অলংকারের আলোচনা করবো। সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে পড়ে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, উল্লেখ, সন্দেহ, দীপক, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, নির্দর্শনা, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তুপমা, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, তুল্যযোগিতা প্রভৃতি। আমাদের আলোচ্য—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অপহ্নুতি, সমাসক্তি, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি ইত্যাদি।

১৬.৪ সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

দুটি বস্তুর সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা একটিকে আর একটির সঙ্গে তুলনা করে থাকি। অতএব, অলংকার-নির্মাণের জন্য যে-সাদৃশ্য কবিরা খোঁজেন, তার মূল শর্তই হল দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান। বস্তুদুটি বাইরে থেকে যত বেশি বিসদৃশ বা বিজাতীয় হবে, সাদৃশ্য তত বেশি সূক্ষ্ম হবে, অলংকার তত আকর্ষক হবে। এই সাদৃশ্য কবিরা প্রধানত তিনটি উপায়ে দেখিয়ে থাকেন :

১. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়েও তাদের জন্য সমান মূল্য বরাদ্দ।

২. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা।

৩. বস্তুদুটির পার্থক্য বা ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া।

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের চারটি অঙ্গ বা অবয়ব:

১. যা তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু।

২. যার সঙ্গে তুলনা।

৩. যে-ধর্ম দুটি বস্তুতেই থাকে এবং বস্তুদুটিকে তুলনীয় করে।

৪. যে ভঙ্গিতে তুলনা করা হয়।

প্রথমটি উপমেয়, দ্বিতীয়টি উপমান, তৃতীয়টি সাধারণ ধর্ম, চতুর্থটি সাদৃশ্য অথবা তুলনাবাচক শব্দ।

উদাহরণ ব্যাখ্যা করে অঙ্গ-চারটি বোঝার চেষ্টা করা যাক:

১৬.৪.১ উপমা

সংজ্ঞা: একই বাক্যে বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উপমা অলংকার।

একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সদৃশ বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের উল্লেখের

দ্বারা যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয় তাকেই উপমা বলে। সংক্ষেপে বলা যায় যে সমধর্মবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোই উপমা বলে।

সর্পসম ক্রূর

খল জল ছল-ভরা।

জল এবং সাপ দুটি ভিন্ন বস্তু, উভয়ের মধ্যে বৈধর্ম রয়েছে; কিন্তু সে বৈধর্মের উল্লেখ নেই; এবং উভয় বস্তুর মধ্যে ক্রূরতা এবং খলত্বের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, চমৎকারিত্বেরও সৃষ্টি হয়েছে এবং একই বাক্যে এই কাণ্ডটি ঘটেছে। তাই এটি উপমা অলংকারের একটি সুন্দর উদাহরণ।

বৈশিষ্ট্য:

১। একটিমাত্র বাক্য থাকবে।

২। দুটি বিজাতীয় বা বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে তুলনা হবে (উপমেয়-উপমান)।

৩। বস্তুদুটির বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যের উল্লেখ থাকবে না।

৪। বস্তুদুটির মধ্যে সাদৃশ্য বা মিলটুকু দেখানো হবে (সাধারণ ধর্ম)।

৫। সাদৃশ্য দেখানো হবে সাধারণত বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে (সাদৃশ্যবাচক শব্দ)। উপমা অলংকারে ব্যবহার্য সাদৃশ্যবাচক শব্দের তালিকাটি এইরকম: মতো, মতন, ন্যায়, রূপে, নিভ, পারা, প্রায়, তুলা, সম, তুল্য, হেন যেমতি, কল্প, সদৃশ, বৎ, যথা যেন, রীতি ইত্যাদি।

অতএব, উপমার চারটি অঙ্গ উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

৬। উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো—বিজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য-প্রতিষ্ঠার এটি প্রথম স্তর।

উপমেয়— যার তুলনা দেওয়া হয়—তা হলো উপমেয়। 'পদ্মের মতো সুন্দর' বললে মুখের তুলনা দেওয়া হচ্ছে, তাই মুখ উপমেয়। মুখকেই আমি বর্ণনা করছি মুখ তাই প্রধান, সে ক্ষেত্রে মুখ উপমেয় ঠিকই থাকত, যার সঙ্গে তুলনা করছি—সেই পদটির বদল হত। তাতে বর্ণনীয় বিষয়ের (পদটির) কিছু যেত আসতো না। তাই উপমেয়কেই আলংকারিকেরা 'প্রকৃত' বা 'বর্ণনীয়' বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। 'মুখ' এখানে প্রকৃত বা বর্ণনীয় বিষয়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে উপমেয়কে প্রস্তুত প্রকৃত বলা হয়েছে।

উপমান— যার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়—তুলনা করা হয়—তাই হচ্ছে **উপমান**। (অর্থাৎ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে বস্তু অনুপস্থিত থাকে—অথচ ঐ অনুপস্থিত বস্তুর উল্লেখ করে তার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে—তাকে উপমান বলে।) উপমেয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত বাক্যে 'পদ্ম' উপমান; কারণ অনুপস্থিত পদ্মের সঙ্গে মুখের তুলনা করা হচ্ছে। উপমান প্রসঙ্গপ্রাপ্ত নয়, কতকটা বাইরের বস্তু, তাই একে অপ্রস্তুত বা অপ্রাকৃত বলা হয়েছে।

সামান্য বা সাধারণ ধর্ম— যে ধর্ম বা গুণ উপমেয় আর উপমানের মধ্যে থেকে তুলনাকে সম্ভব ও সফল করে তোলে তাকে **সামান্য বা সাধারণ ধর্ম** বলে। পদ্মে এবং মুখে সৌন্দর্য রয়েছে, এবং এই

সদৃশ ধর্মের সূত্র ধরেই উপমান এবং উপমেয়ের মেলবন্ধন ঘটেছে। তাই 'সুন্দর' সামান্যধর্ম। সংক্ষেপে বলা যায় যে উপমেয় এবং উপমানের যা সাধারণ সম্পত্তি—তাই সামান্যধর্ম। সামান্য ধর্মের আর এক নাম হচ্ছে সাধারণ ধর্ম।

সাদৃশ্যবাচক শব্দ—মতো বা মতে, মতন, সম, যথা, নিভ, তুল, সমতুল, যেমন, জনু, যথা, যৈছে, প্রায়, পারা, উপমা, তুল্য, হেন, ন্যায়, জাতীয়, সদৃশ, সমান, যেন, প্রতিম, ভাতি, রীতি, সংকাশ, প্রমাণ, বৎ—প্রভৃতি অব্যয়গুলিকে (যাদের দ্বারা উপমা বোঝায়) **সাদৃশ্যবাচক শব্দ** বলে। এরাই উপমেয় এবং উপমানকে একত্রে গ্রথিত করে। উদাহরণ—

মতো: (ক) ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ।
(খ) মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে।

মতন: (ক) তারার মতন স্থির, হীরকের মতো শুচিস্মিত।
(খ) প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ এইখানে থাকে।

সম: (ক) এ হৃদয় মম।
তপোভঙ্গভয়ভীত তপোবন সম।

যথা: সিন্দুর বিন্দু শোভিত ললাটে
গোধূলি ললাটে আঁকা তারারত্ন যথা।

নিভা: হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ।

তুল: তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল্ কোন্ ফুল?

সমতুল: রচিয়াছ রাজা-কবি! কাহিনী প্রিয়ার
আঁখিজল জমানো বরফ—
সমতুল মর্মর—কাগজ তুহার
দুনিয়ার মাণিক হরফ।

যেমন: আমরা একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর (পদ্মার) উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে অথচ দূর দিয়ে।

সদৃশ: অগ্নি সদৃশ্য ক্রোধে সে জ্বলছে,
নবনী সদৃশ মনটা গলছে।

যেন: মায়ার আবর্ত রচে আসায় যাওয়ার চঞ্চল সংসারে।
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায় ভাটায় জোয়ারে।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

বাংলায় উপমার উল্লেখযোগ্য বিভাগ পাঁচটি

(ক) পূর্ণোপমা;

(খ) লুপ্তোপমা;

(গ) মালোপমা;

(ঘ) স্মরণোপমা;

(ঙ) মহোপমা।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

১৬.৪.১.১ পূর্ণোপমা:

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা (পূর্ণ + উপমা)।

উদাহরণ:

(ক) আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম।

সংকেত: ‘ছুরি’ এখানে উপমেয়, ‘প্রভাতরশ্মি’ উপমান, ‘তীক্ষ দীপ্ত’ সামান্য ধর্ম আর ‘সম’ হচ্ছে সাদৃশ্যবাচক শব্দ। এখানে উপমার চারটে অঙ্গই উপস্থিত।

(খ) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে

গোধূলি-ললাটে, আহা! তারার-যথা!

সংকেত: উপমেয় ‘সিন্দুরবিন্দু’, উপমান ‘তারার’, সাধারণ ধর্ম ‘শোভাসৃষ্টি’ (‘শোভিল’—ক্রিয়াগত), সাদৃশ্যবাচক শব্দ ‘যথা’।

১৬.৪.১.২ লুপ্তোপমা:

সংজ্ঞা: যে উপমা অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের (উপমান-সাধারণ ধর্ম-সাদৃশ্যবাচক শব্দ) যে কোনো একটি বা দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে (অর্থাৎ, এদের উল্লেখ থাকে না), তার নাম লুপ্তোপমা (লুপ্ত + উপমা)।

উদাহরণ:

১. সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত বাক্যে 'বন্যেরা' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), 'শিশুরা' উপমান (অন্য বস্তু যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), সাধারণ ধর্ম 'সৌন্দর্য' ('সুন্দর' হওয়ার গুণটি উপমেয়-উপমান দু-পক্ষেই আছে), কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'বন্যেরা' এবং 'শিশুরা' এই দুইটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে, কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে। অতএব, এটি উপমা অলংকার। অলংকারটিতে উপমেয় ছাড়া উপমান, সাধারণ ধর্মেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু একটি অঙ্গ সাদৃশ্যবাচক শব্দের উল্লেখ নেই বলে এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

ভদ্র মোরা শান্ত বড়ো
পোষমানা এ প্রাণ।
বোতাম আঁটা জামায় নীচে
শান্তিতে শয়ান।

এখানে উপমান 'পাখি' এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মতো' অনুপস্থিত। পোষমানা পাখির মতো প্রাণ—এই অর্থ ব্যঞ্জিত হচ্ছে।

২. সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত চরণে 'চোখ' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), 'পাখির নীড়' উপমান (অন্য বস্তু, যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), 'মতো' সাদৃশ্যবাচক শব্দ, কিন্তু সাধারণ ধর্ম (প্রশান্তি) লুপ্ত। উদ্ধৃত চরণটিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'চোখ' আর 'পাখির নীড়' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, অলংকার এখানে উপমা। অলংকারটিতে উপমেয় আছে, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের অন্যতম সাধারণ ধর্ম লুপ্ত বলে এটি 'লুপ্তোপমা'।

৩. সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

(ক) কচি কলাপাতা সন্ধ্যা।

ব্যাখ্যা: তিন শব্দের এই বাক্যে 'সন্ধ্যা' উপমেয়, 'কচি কলাপাতা' উপমান, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত। বাক্যটিতে 'সন্ধ্যা' আর 'কচি কলাপাতা' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি উপমা অলংকার। কিন্তু উপমেয়ের উল্লেখ থাকলেও অন্য তিনটি অঙ্গের একমাত্র উপমান ছাড়া আর দুটি অঙ্গই (সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম) লুপ্ত। সুতরাং, এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

৪. উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে।

কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত বাক্যের শেষ শব্দ 'হরিণ-চোখ'-এ সাদৃশ্যের সঞ্চার হয়েছে। 'হরিণ-চোখ' আসলে হরিণের চোখ নয়, ওটা কালো মেয়েরই চোখ। সাদৃশ্যের টানেও হরিণ আসেনি, এসেছে হরিণের চোখ-ই। কেননা, কবির দৃষ্টিপাত কালো মেয়ের চোখের প্রতি নিবদ্ধ। অর্থাৎ, এখানে বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয় কালো মেয়ের 'চোখ' যা কবি দেখেছিলেন, আর উপমান হরিণের 'চোখ' যা কবি কল্পনা করেছিলেন। 'হরিণ-চোখ'-এর অর্থ যদি 'হরিণের চোখ' হত, তাহলে ওই 'হরিণ-চোখ'-এ সমাসবদ্ধ হয়ে তা উপমান 'চোখ' আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মতো' দুটিকেই হারিয়েছে, রক্ষা করেছে কেবল কালোমেয়ের 'চোখ', যা হরিণের চোখের মতোই কালো, অতএব উপমেয়। সুতরাং, বাক্যটিতে দুটি বিজাতীয় বস্তু 'কালো মেয়ের চোখ' ও 'হরিণের চোখ'-এর সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, তৈরি হয়েছে উপমা অলংকার। আর, উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত রয়েছে বলে এটি নিঃসন্দেহে লুপ্তোপমা। 'মেয়ে' আর 'হরিণ' বিজাতীয়, অতএব তাদের চোখও বিজাতীয়।

৫. উপমান সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

নীরবিলা বীণাবাণী

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে উদ্ধৃত উদাহরণটিতে উপমেয় প্রমীলা—'বীণাবাণী'-বিশেষণের রূপে। কিন্তু, উপমান সাধারণ ধর্ম সাদৃশ্যবাচক শব্দে এখানে লুপ্ত। বীণার বাণীর মতো বাণী যার, সেই প্রমীলা উপমেয় হলেও 'বীণা' তার উপমান নয়, 'বাণী'র সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে তা প্রমীলার বিশেষণ হয়ে আছে। তবে 'বাণী'র ধারক হিসেবে 'বীণা'র সঙ্গে প্রমীলা সাদৃশ্যসূত্রে বাঁধা পড়েছে। সুতরাং, বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো ফলে এখানে উপমা অলংকার হয়েছে এবং উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গই লুপ্ত থাকার কারণে এটি লুপ্তোপমা।

১৬.৪.১.৩ মালোপমা :

সংজ্ঞা: যে উপমা অলংকারে উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি, তার নাম মালোপমা (মালা + উপমা)।

এক উপমেয়ের যদি একাধিক উপমান হয়—তবেই তাকে মালোপমা বলে। অর্থাৎ উপমেয় একটা, তার অনেকগুলো উপমান। এখানে উপমা দিয়ে যেন মালা রচনা করা হয়। যদি বলা যায়—'বজ্রের মতো কঠোর, কুসুমের মতো মৃদু হিমশিলার ন্যায় স্বচ্ছ ও গঙ্গাধারার ন্যায় বিদ্রুত তাঁর চিত্ত'—তাহলে মালোপমা অলংকার হবে। 'চিত্ত'—এখানে একটি মাত্র উপমেয়, এবং এর উপমান 'বজ্র', 'কুসুম', 'হিমশিলা' আর 'গঙ্গাধারা'। এই চারটে উপমান দিয়ে উপমার মালা রচনা করা হয়েছে তাই একে মালোপমা বলা হয়।

উদাহরণ:

(i) তোমার সে-চুল।

জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন।—বুদ্ধদেব বসু।

সংকেত: উপমেয় 'চুল', উপমান 'সূতা' আর 'মেঘ'।

(খ) সুখ অতি সহজ সরল, কাননের প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু-আননের হাসির মতন।

(সুখের দুটি উপমান—ফুল আর হাসি।)

১৬.৪.১.৪ স্মরণোপমা

কোনো বস্তুর স্মরণ বা অনুভব থেকে যদি সমধর্মের অন্য কোনো বস্তুকে মনে পড়ে যায় তবে স্মরণোপমা অলংকার হবে। একটি বস্তুর স্মরণে অনুরূপ আর কোনো বস্তু—যা সদৃশ্য কিম্বা বিসদৃশ যাই হোক না কেন, কিন্তু বিসদৃশ হলে সামান্য ধর্মের জোরে (অর্থাৎ একই গুণ বা ক্রিয়ার দৌলতে) সদৃশতা প্রাপ্ত হয়েছে—তা যদি স্মৃতিপথে উদিত হয় তবেই স্মরণোপমা হবে।

যদি একটি বস্তুর স্মরণে অন্য বা বিসদৃশ বস্তুর কথা মনে পড়ে, এবং ঐ মনে পড়ার মধ্যে যদি চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয় তবে তা স্মরণ বা স্মরণালংকার, স্মরণোপমা নয়। স্মরণোপমার সাদৃশ্যের জোরে উপমান থেকে উপমেয়ের স্মরণ ঘটে।

(ক) কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে। [চণ্ডীদাসের এই পংক্তিতে কালো জল ঢালতে গিয়ে শ্রীরাধিকার কালো বরণের শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হয়েছে। জল এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন বস্তু, কিন্তু 'কালো' এই গুণে (সামান্য ধর্মের জোরে) উভয়েই সদৃশতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং একের স্মরণ বা অনুভব অন্যকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, সুতরাং এটি স্মরণোপমা অলংকার।]

১৬.৪.১.৫ মহোপমা

মহোপমা ঠিক একটি অলংকার নয়। তাই অনেক আলংকারিকরা একে উপমার স্বতন্ত্র শ্রেণি বলে স্বীকার করেননি। যে উপমায় উপমানের সৌন্দর্য এমনভাবে বাড়ানো হয়, যাতে প্রায় একটি নতুন চিত্রের সৃষ্টি হয়, তখন সেই অলংকারকে মহোপমা বলা হয়।

১৬.৪.২ রূপক

সংজ্ঞা: বিষয়ের অপহ্নব না ঘটিয়ে (উপমেয়কে লুপ্ত না করে) তার ওপর বিষয়ীর (উপমানের) অভেদ আরোপ করলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম রূপক অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক।)

উপমান উপমেয়ের তুলনা করতে গিয়ে যখন তাদের অভেদ কল্পনা করা হয়—তখন রূপক অলংকার হয়। এমনভাবে অভেদ কল্পিত হয়—যাতে মনে হবে যে উপমেয় আর উপমানের যেন কোনো পার্থক্যই নেই। এই পার্থক্য না-থাকাটা কিন্তু কাল্পনিক। উপমেয়ের ওপর উপমানকে

এমনভাবে আরোপ করতে হবে যাতে উভয় বস্তুর সর্বসাম্য ঘটে অর্থাৎ উপমেয় আর উপমান একীভূত হয়ে যায়। একের রূপ অন্যে আরোপিত হয় বলেই এই অলংকারের নাম রূপক হয়েছে।

রূপক অলংকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে উপমানের প্রাধান্য ঘটবে। তাই আপাতদৃষ্টিতে রূপক অলংকার যতটা সহজবোধ্য বলে মনে হয়, আসলে এটি ততখানি সহজ নয়।

উপমান-উপমেয়ের পৃথক সত্তা বজায় থাকলে বুঝতে হবে উপমা অলংকার হয়েছে, আর ওরা যখন এক হয়ে যায়—তখনই হয় রূপক অলংকার।

আধুনিক বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে রূপক অলংকারের অজস্র ছড়াছড়ি। বাউল-মাঠ, পথিক-মন, ভালোভাসার পাখি, রোদ-শাড়ি, স্বপ্নের কুসুম কি প্রাণের সিঁড়ি, আকাশ-আঙিনা, ফর্সা সাদা মেয়ে-পদ্মচর, গানের ঝুমঝুমি—বা এই জাতীয় আরো অনেক কিছু।

বৈশিষ্ট্য:

১। বাক্যে উপমেয় এবং উপমানের উল্লেখ থাকবে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকবে না।

২। উপমেয় এক হয়ে যাবে উপমানের সঙ্গে। এরই নাম অভেদ। সাদৃশ্যের প্রথম স্তর উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো (উপমা), দ্বিতীয় স্তরভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো (ব্যতিরেকে), তৃতীয় স্তর অভেদ (রূপক)।

৩। বাক্যে উপমানই প্রধান, ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বাক্যাংশ উপমানকেই অনুসরণ করবে। উপমেয় লুপ্ত নয়, তবে গৌণ।

৪। জীবন অঙ্গী, শৈশব-যৌবন বার্ধক্য তার অঙ্গ; আকাশ অঙ্গী, মেঘ-তারা-নীলরং তার অঙ্গ; নদী। অঙ্গী, ধারা-ঢেউ-ফেনা-তীর তার অঙ্গ। অঙ্গী উপমেয়ের অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গী উপমানের অঙ্গের অভেদ হতে পারে।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

বাংলায় রূপকের উল্লেখযোগ্য বিভাগ তিনটি—

(ক) নিরঙ্গরূপক; (খ) সাঙ্গরূপক; (গ) পরম্পরিত রূপক। এছাড়া আছে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক, আখ্যানরূপক। তবে প্রথম তিনটি রূপকই প্রধান।

নিরঙ্গরূপক দু-রকমের—

(ক) কেবল নিরঙ্গরূপক; (খ) মালা নিরঙ্গরূপক।

১৬.৪.২.১ নিরঙ্গরূপক

সংজ্ঞা: যে রূপক অলংকারে কোনো অঙ্গের অভেদ কল্পনা না করে কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম নিরঙ্গরূপক। নিরঙ্গ রূপকের আর এক নাম হচ্ছে সাধারণ রূপক। এই রূপকে একটি মাত্র উপমেয় আর একটি মাত্র

উপমানের অভেদ বোঝায়। যে রূপকটির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে উপমান বা উপমেয়ের মধ্যে বিস্তৃত কোনো আলোচনা থাকে না, অর্থাৎ রূপকের অন্তর্গত উপমেয়ের কোনো অঙ্গেরই ব্যাখ্যা থাকে না, বা উপমানের কোনো অঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা বলা হয় না—কেবল রূপকটিই উল্লিখিত হয়। যেমন—

দোসর ওগো দোসর আমার, কোন্ সুদূরে।
ঘরছাড়া মোর ভাবনা-বাউল বেড়ায় ঘুরে।

এখানে উপমেয় 'ভাবনা' আর উপমান 'বাউল' এই দুই পদের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে, ঘুরে বেড়ানো ক্রিয়ার উল্লেখে বোঝা গেল উপমান প্রধান্য লাভ করেছে উপমেয় এবং উপমানের কোনো অঙ্গ সম্পর্কে কোনো বিস্তার হয়নি, সুতরাং এটি নিরঙ্গ রূপক।

নিরঙ্গরূপক দুরকমের, কেবল আর মালা। একটি উপমানের অভেদ আরোপ হলে কেবল নিরঙ্গরূপক, আর একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ হলে মালা নিরঙ্গরূপক।

উদাহরণ:

১১.৪.২.১.১ কেবল নিরঙ্গরূপক (একটি উপমেয়, একটি উপমান)—

(i) শিশুফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে।

সংকেত: উপমেয় 'শিশু', উপমান 'ফুলগুলি'। ক্রিয়াপদ 'ফুটে' 'ফুলগুলি'র অনুসারী। 'শিশু'র ওপর কেবল 'ফুলগুলি'র অভেদ আরোপ।

(ii) যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।

সংকেত: উপমেয় 'যৌবন', উপমান কেবল 'মৌবন'। 'মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি'—এই বাক্যাংশ উপমান 'মৌবন'-এর অনুসারী।

মন্তব্য: এখানে 'যৌবনেরি মৌবনে' অংশে 'বনে' ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ (মৌ-'বনে') এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ (যৌ-'বনে'-রি) হচ্ছে বলে নিছক যাক অলংকারও হয়েছে। লক্ষণীয়, 'মৌবনে' শব্দটি 'মৌ' এবং 'বনে'—এ দুটি স্বতন্ত্র শব্দের সমাসে তৈরি বলে 'বনে' শব্দের মর্যাদা পাবে।

১৬.৪.২.১.২ মালা নিরঙ্গরূপক (মালারূপক একটি উপমেয়, একের বেশি উপমান)—

একটি উপমেয়কে কেন্দ্র করে বহু উপমানের যদি আরোপ হয় (এবং বলাবাহুল্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপমান-উপমেয়ের মধ্যে অভেদ বোঝাবে)—তবে তাকে মালা রূপক বলে। বিদ্যাপতির কবিতাংশ এই মালারূপকের অত্যন্ত বিখ্যাত উদাহরণ।

(ক) শীতের ওড়নী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।।

(এখানে 'পিয়া' (প্রিয়া)—এই একটি উপমাকে কেন্দ্র করে শীত বস্ত্র, গ্রীষ্ম বাতাস, বর্ষার ছাতা আর দরিয়ার নৌকা—এতগুলি উপমানের অভিন্নতা আরোপিত হয়েছে—তাই একে মালা রূপক বলা হয়েছে।)

(খ) অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
চারদিকে চিরযামিনী।

সংকেত: উপমেয় 'তুমি একা', উপমান 'একটি স্বপ্ন', 'একটি পদ্ম', 'একটি চন্দ্র'। একটি উপমেয়ের ওপর তিনটি উপমানের অভেদ আরোপ।

১৬.৪.২.২ সাঙ্গরূপক:

সংজ্ঞা: যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম সাঙ্গরূপক। অর্থাৎ, উপমেয়-উপমান অঙ্গসমেত এক হয়ে গেলে সাঙ্গরূপক। উপমেয় আর উপমানে অভেদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের অঙ্গগুলিরও অনুরূপ অভেদ দেখানো হয়— তবেই সাঙ্গরূপক অলঙ্কার হয়। সোজা কথায়, উপমেয়ের অঙ্গগুলিও যদি উপমানের অঙ্গগুলির সঙ্গে অভেদ-কল্পনার দ্বারা একীভূত হয়ে যায়, তবেই সাঙ্গরূপক হয়।

উদাহরণ:

(ক) শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে?

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত স্তবকে একদিকে উপমেয় 'আকাশ' অঙ্গী, অন্যদিকে উপমান 'গাঙ' অঙ্গী। অঙ্গী 'আকাশ'-এর অঙ্গ 'মেঘ' 'জ্যোৎস্না' 'ধরা'—কেননা, মেঘ-জ্যোৎস্নার আধার আকাশ, আকাশ থেকে যাত্রা শুরু, ধরায় যাত্রাসমাপন। অন্যদিকে অঙ্গী 'গাঙে'র অঙ্গ 'পাল' 'তরী' 'ঘাট'—পালসহ তরী গাঙেই ভাসে, ঘাট গাঙেরই সংলগ্ন হয়ে থাকে। উদ্ধৃত বাক্যে 'পালটি মেলে' বাক্যাংশ উপমান 'গাঙ'র সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অর্থাৎ 'আকাশ'-এর ওপর 'গাঙ'-এর অভেদ আরোপে এখানে রূপক অলংকার হয়েছে। সেই সঙ্গে উপমেয় 'আকাশ'-এর অঙ্গ 'মেঘ', 'জ্যোৎস্না' আর 'ধরার ওপর উপমান 'গাঙ'-এর অঙ্গ যথাক্রমে 'পাল', 'তরী' আর 'ঘাট'-এর অভেদ-ও আরোপ করা হয়েছে (অর্থাৎ মেঘ-পাল, জ্যোৎস্না-তরী আর ধরা-ঘাট এক হয়ে গেছে।) অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়েছে বলে।

(খ) সৌন্দর্য-পাথারে

যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী

সে বাতাসে, কতবার মনে শঙ্কা করি,

ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল;

অঙ্গী উপমেয় 'সৌন্দর্য', তার অঙ্গ 'বেদনা', 'মন', 'হৃদয়'। অঙ্গী উপমান 'পাথার' তার অঙ্গ 'বায়ু', 'তরী', 'পাল'।

১৬.৪.২.৩ পরম্পরিত রূপক:

সংজ্ঞা: যে রূপক অলংকারে একটি উপমেয়ের ওপর একটি উপমানের অভেদ-আরোপের কারণে অন্য একটি উপমেয়ের ওপর অন্য একটি উপমানের অভেদ-আরোপের জন্ম হয়, তার নাম পরম্পরিত রূপক।

একটি নিরঙ্গরূপক থেকে আর একটি নিরঙ্গরূপকের জন্ম—এইভাবে রূপকের পরম্পরা বা ধারা তৈরি হতে থাকে বলে এর নাম পরম্পরিত রূপক।

একটি রূপকের সৃষ্টি করে তাকে আরো সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তোলার জন্যে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন আর একটা রূপকের অবতারণা করা যায়—তাহলে পরম্পরিত রূপক হয়। অর্থাৎ একটি রূপকের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য একের বেশি রূপক সৃষ্টি করলেই পরম্পরিত রূপক হয়।

এই অলংকারে প্রথম রূপকটি দ্বিতীয় রূপকটির কারণ হয়ে থাকে। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয় রূপকটি কার্যকারণ ভাবের পরম্পরা। অর্থাৎ ধরা থাকে—তাই এ জাতীয় রূপকের নাম পরম্পরিত রূপক। একটি উদাহরণ ধরা যাক :

চঞ্চল চরণ— কমল-তলে ঝঙ্করু।

ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।

এখানে মহাপ্রভুর চরণকে কমলের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করায় দ্বিতীয় রূপকটির জন্ম। দ্বিতীয় রূপকটির কারণ কিন্তু এই প্রথম রূপকটি। চরণে কমলত্ব আরোপের জন্যই ভক্তগণ যাঁরা মহাপ্রভুর পায়ের কাছে রয়েছেন, ভ্রমররূপে কল্পিত হয়েছেন। চরণ কমল হয়েছে বলেই ভক্তকে ভ্রমর হতে হয়েছে। পরম্পরিত রূপকে প্রথম রূপকটিকে সৌন্দর্য ও সৌকর্য দানের জন্যে, অর্থাৎ বেশি করে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই দ্বিতীয় রূপকটির ব্যবহার হয়।

উদাহরণ:

(ক) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে

রেখেছে সন্ধ্যা আঁধারপর্ণপুটে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: প্রথম উপমেয় 'আলো'র ওপর প্রথম উপমান 'কমলকলিকা'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'আঁধারে'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'পর্ণপুট'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। সেই কারণে এখানে পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়েছে। 'আলো-আঁধার' আর 'কমলকলিকা-পর্ণপুট'-এ অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক থাকলেও কার্যকারণ-পরম্পরার ভাব প্রবল হওয়ায় এখানে সাঙ্গরূপক না হয়ে পরম্পরিত রূপকই হয়েছে।

(খ) তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছো ভবিষ্যৎ আর
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: প্রথমে উপমেয় 'দীর্ঘশ্বাস'র ওপর প্রথম উপমান 'ধোঁয়ার'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'অনুশোচনার' ওপর দ্বিতীয় উপমান 'আগুন'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। আবার দ্বিতীয় অভেদ-আরোপ থেকে তৃতীয় উপমেয় 'উৎসাহ'-এর ওপর তৃতীয় 'কয়লা'র অভেদ-আরোপের জন্ম—এইভাবে রূপকের কার্যকারণ-পরম্পরা তৈরি হচ্ছে বলে এটি পরম্পরিত রূপক।

১৬.৪.২.৪ অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক

উপমানে যদি কোনো বিশেষ কিম্বা অসম্ভব গুণ বা ধর্ম আরোপ করা হয় এবং ঐ বিশেষ গুণ বা ধর্মযুক্ত উপমানকে যদি উপমেয়ের ওপর অভিন্নভাবে স্থাপিত করে রূপক সৃষ্টি করা হয়—তখন সেই রূপককেই অধিকারূঢ়বশিষ্ট্য রূপক বলে। উপমানে একটি বৈশিষ্ট্য অধিক আরূঢ় হয় বলেই এই অলংকারকে 'অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য' রূপক বলে অভিহিত করা হয়েছে। অনেক আলংকারিক এই জাতীয় রূপককে শুধু 'বিশিষ্ট' রূপক বলে অভিহিত করেছেন। বিশিষ্ট নামটি বলা বাহুল্য যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনই শোভন ও সুন্দর। একটি উদাহরণ ধরা যাক—

হায়েনার হাসি যখন কাঁপাচ্ছে বন,
কালো এই দুর্যোগের রাতে
দিকে দিকে মানুষের ব্যাকুল নিঃশ্বাস;
তুমি শুধু স্থির, শান্ত, অচপল চোখ,
সুধীর নিশ্চল তব তনুর সমুদ্র।

এখানে 'তনুর সমুদ্র' কাব্যাংশে রূপক রয়েছে, তনুতে সমুদ্রত্ব আরোপিত হয়েছে। 'তনু' উপমেয়, সমুদ্র উপমান। সমুদ্র দুর্যোগের রাতে নিশ্চল থাকে না, সুধীর অবস্থা সমুদ্রের কোনো সময়ই থাকে না। এখানে এই রূপক অলংকারে (তনুর সমুদ্র—এই রূপকে) উপমান 'সমুদ্রে' ধীরতা ও নিশ্চলতা—এই অসম্ভব গুণ আরোপ করা হয়েছে, এবং এই অসম্ভব গুণযুক্ত করেই উপমানকে উপমেয়ের ওপর আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং এটি বিশিষ্ট অথবা অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপকের সুন্দর উদাহরণ।

নীচে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিলাম—

(ক) অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।

(হরিণ—কলঙ্ক, হিমধামা—চাঁদ।)

(খ) সারা দেহব্যাপী তড়িতের খেলা একি দেখি অচপল।

(যৌবনদীপ্তিকে 'অচপল তড়িৎ' কল্পনার জন্যে অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক হয়েছে।)

১৬.৪.৩ উৎপ্রেক্ষা

সংজ্ঞা: গভীর সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতকে (উপমেয়কে) যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট (প্রবল) সংশয় হয় এবং যদি সে সংশয় কবিত্বময় হয়ে ওঠে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উৎপ্রেক্ষা অলংকার। উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা।

উৎপ্রেক্ষার অর্থ হল সংশয়। অবশ্য প্রত্যয়গত অর্থ হচ্ছে উপমা সম্পর্কে উৎকট ধারণা। উপমেয়কে যদি প্রবলসাদৃশ্যের জন্যে উপমান বলে সংশয় হয়—তখন উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। অন্যভাবে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে যেখানে উপমান বস্তুতে উপমেয়ের সম্ভাবনা আরোপিত হয় সেখানেই উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

উৎপ্রেক্ষা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই অলংকারে সংশয়ের ভাব থাকবেই এবং সেই সংশয়ে উপমানই বেশি প্রবল হয়ে উঠবে। বাংলা ভাষার উপমার পরই কিন্তু উৎপ্রেক্ষার আধিপত্য।

বৈশিষ্ট্য:

১। উপমেয়-উপমানের সাধারণ সাদৃশ্য থেকে উপমা, অভেদ থেকে রূপক, আর প্রবল সংশয় থেকে উৎপ্রেক্ষা। গভীর সাদৃশ্য এ সংশয়ের কারণ।

২। সংশয় একদিকে—উপমেয়কে উপমান বলে সংশয়।

৩। এ সংশয় কবিত্বময়, সাধারণ সংশয় থেকে অলংকার হয় না।

৪। কবিত্বের গুণে প্রত্যক্ষ উপমেয়ের তুলনায় কাল্পনিক উপমানকেই বেশি সত্য বলে মনে হয়।

প্রকারভেদ—

উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু-রকমের—

(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (বাচ্য + উৎপ্রেক্ষা) (খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (প্রতীয়মান + উৎপ্রেক্ষা)

বাচ্য এবং প্রতীয়মান—এই দু'রকমের উৎপ্রেক্ষা ছাড়া মালোৎপ্রেক্ষা (মালা + উৎপ্রেক্ষা) বলে আর এক রকমের উৎপ্রেক্ষার উল্লেখ করেছেন কয়েকজন আলংকারিক। কিন্তু উৎপ্রেক্ষা অলংকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝলেই মালোৎপ্রেক্ষা বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না।

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

১৬.৪.৩.১ বাচ্যোৎপেক্ষা:

সংজ্ঞা: যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'যেন', 'বুঝি, 'জনু', 'প্রায়', 'মনে হয়', 'মনে গণি' জাতীয় কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তার নাম বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

উপমেয়কে প্রবল সাদৃশ্যের জন্যে উপমান বলে সংশয় হবে—আর সেই সংশয় সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ—(বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'যেন' শব্দের জ্বলন্ত উপস্থিতিতে) যখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখনই বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার হবে।

উদাহরণ:

(ক) বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত উদাহরণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী' (অশোকবনে সীতার পদতলে বসা সরমা), উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' (প্রদীপ)। সীতার পদতলে বসা যুবতী সরমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুলসীতলায় জ্বলে উঠল সন্ধ্যার প্রদীপটি। দুটি দৃশ্যেই আছে একটি পবিত্র সৌন্দর্য। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী'কে উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। অতএব, এটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার। সংশয়বাচক 'যেন' শব্দের সংযোগে, সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বলে এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(খ) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: কলঙ্কিত গোলাকৃতির সাদৃশ্যে উপমেয় 'পূর্ণিমা-চাঁদ'-কে ক্ষুধাতুর মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপমান 'ঝলসানো রুটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অতএব, এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

১৬.৪.৩.২ প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা:

সংজ্ঞা: যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমান করে নেওয়া যায়, তার নাম প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

সম্ভাবনাসূচক শব্দ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সম্ভাবনার ভাবটি স্পষ্ট বোঝা যায়। অন্যভাবে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে যেখানে উৎপ্রেক্ষা বাচক বা সম্ভাবনাসূচক শব্দগুলি থাকে না, অথচ সম্ভাবনার ভাবটি স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে সেইখানেই প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। যেমন—

উদাহরণ:

(ক) এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'ব্রহ্মাণ্ড', উপমান 'মাকাল ফল। বাইরের রূপ লোভনীয় অথচ ভেতরের সারশূন্য 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং 'মাকাল ফল' দুই-ই। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণ 'ব্রহ্মাণ্ড'-কে একটি ঝুলন্ত প্রকাণ্ড 'মাকাল ফল' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়ের কবিত্বময় প্রকাশে এখানে অলংকার হয়েছে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়মূলক শব্দের কোনো উল্লেখ নেই বলে উদাহরণটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

(খ) কুহেলী গেল আকাশে আলো
দিল যে পরকাশি,
ধূর্জটীর মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

(এখানে শেষ পঙ্‌ক্তির আগে একটি 'যেন' না হলে অর্থ হচ্ছে না। কুয়াশার পর আকাশের আলোর স্নিগ্ধতাকে পার্বতীর হাসি বলে সংশয় হচ্ছে। এই সম্ভাবনার ভাবটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, অথচ 'যেন' বা ঐ জাতীয় কোনো শব্দের প্রয়োগ নেই, তাই এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।)

১৬.৪.৪ অপহ্নুতি

উপমেয়কে নিষিদ্ধ করে বা গোপন রেখে উপমানকে স্থাপন বা প্রকাশ করাকে অপহ্নুতি অলংকার বলে। অপহ্নুতি কথাটির অর্থ হল গোপন বা অস্বীকার। উপমেয় অর্থাৎ প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের অস্বীকার করে অপ্রকৃতকে অর্থাৎ উপমানকে স্বীকার করে নেওয়া বা প্রকাশ করা হয় বলেই এই অলংকারের নাম অপহ্নুতি। এই অলংকারে প্রায়ই না, নয়, ছলে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকে। না, নয় প্রভৃতির দ্বারা অপহ্নুতি অলংকার সূচিত হলে উপমেয় এবং উপমান পৃথক বাক্যে বসে; আর, ছলে বা ছলনায় শব্দের প্রয়োগে অপহ্নুতি অলংকার সূচিত হলে উপমান প্রায়ই এক বাক্যে বসে থাকে। যেমন—

বৃষ্টিচ্ছলে গগন কাঁদিলা।

এখানে বৃষ্টি উপমেয় অর্থাৎ আসল বর্ণনীয় বিষয়, কিন্তু বৃষ্টিকে অস্বীকার করে গগনের কান্নাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হলো। এই কান্না এখানে উপমান। উপমেয়কে অস্বীকারপূর্বক উপমানকে প্রকাশ করা হলো। তাই এটি অপহ্নুতি অলংকার। একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে 'ছলে' শব্দটি থাকায়—উপমেয় ও উপমান একই বাক্যে ন্যস্ত হয়েছে। আরও কয়েকটি উদাহরণ—

(ক) শিশির বিন্দুর চলে উষা দেবী কুতুহলে

ফুল্ল নলিনীর ভালে
পরাইছে সাবধানে মুকুতার মালা।

এখানে শিশিরকে মুক্তার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে—তাই শিশির উপমেয়, আর মুক্তা উপমান। শিশির জমেছে পদ্মের ওপর, কিন্তু কবি বলেছেন—ও যে মুক্তার মালা। উপমেয় গুপ্ত বা নিষিদ্ধ (অর্থাৎ অস্বীকৃত) থাকছে। উপমানই সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত বা প্রকাশিত, তাই এটি অপহ্নুতি অলংকার। এখানেও 'ছলে' শব্দের দ্বারা অপহ্নব (নিষেধ বা অস্বীকার) সূচিত হয়েছে বলে একই বাক্যে উপমেয় এবং উপমান অবস্থিত।

(খ) এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।

(গ) ও যেন বৃষ্টি নয়;
কোনো বিরহিণী দিগ্বধূর অশ্রান্ত ক্রন্দন।

(ঘ) তারাই আজ নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হয়ে অন্নহারা।
দেশের যত নদীর ধারা, জল না ওরা অশ্রুধারা।

(ঙ) কপালে সিন্দুর বিন্দু নব অরবিন্দ বন্ধ,
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তলা ছলা
বন্দী সে করিলা রবি-ইন্দু।।

(এখানে 'কুন্তল' হচ্ছে উপমেয়, আর উপমান হলো তিমির। 'ছলা' শব্দের উপস্থিতিতে বোঝা যাচ্ছে যে উপমেয় অস্বীকৃত হয়েছে এবং উপমানেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে।)

১৬.৪.৫ সমাসোক্তি

সংজ্ঞা: বর্ণনীয় বিষয়ের (উপমেয়) ওপর অন্যবস্তুর (উপমান) ব্যবহার আরোপ করা হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সমাসোক্তি অলংকার। উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হলে সমাসোক্তি।

প্রস্তুতে অর্থাৎ বর্ণনীয় অপ্রস্তুতের অর্থাৎ অন্য বিষয়ের ব্যবহার আরোপকে সমাসোক্তি বলে। বর্ণনীয় নির্জীব পদার্থে সজীব পদার্থের ব্যবহার যখন সমান কাজ, সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণের দ্বারা আরোপ করা হয়—তখন সমাসোক্তি অলংকার হয়। সোজা উপমানের গণ বা কর্মের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্জীব বস্তুতে চেতনা আরোপের সহজ অর্থ হলো জড়ে মনুষ্যধর্মের আরোপ। এই আরোপ কিন্তু সংক্ষেপে সারতে হয়; সংক্ষেপকেই সমাস বলে, এবং উপমেয়ে উপমানবস্তুর সমারোপ সংক্ষেপে উক্ত হয় বলেই এই অলংকারের নাম সমাসোক্তি।

বৈশিষ্ট্য: ১। উপমানের কোনো উল্লেখ থাকে না, তবে তার ব্যবহার বা আচরণের উল্লেখ থাকে।

২। উপমেয় একা এবং আরোপিত আচরণ পুরোপুরি উপমানের।

৩। উপমেয়ের ওপর আরোপিত ব্যবহার থেকেই উপমানকে চেনা যায়।

৪। ব্যবহার বা আচরণ সাধারণভাবে গুণগত বা ক্রিয়াগত।

৫। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপমেয় অচেতন বস্তু, তার ব্যবহার চেতনের।

উদাহরণ:

(i) শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই,
'আয়' 'আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।

সংকেত: যে কান্না মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অচেতন 'সানাই'-এর ওপর তা আরোপিত। চেতন মানুষই এখানে উপমেয়, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, আছে তার ব্যবহারের (কান্নার) উল্লেখ। এই ব্যবহারের আরোপ হল 'সানাই'-এর ওপর। অতএব, 'সানাই' এখানে অনুক্ত 'মানুষ'-এর উপমান। অলংকার সমাসোক্তি।

(ii) শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছে এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া;

ব্যাখ্যা: 'বসুন্ধরা' উদ্ধৃত স্তবকের উপমেয় বা বর্ণনীয় বিষয়, উপমানের উল্লেখ নেই। আমাদের পরিচিত 'বসুন্ধরা (মাটির পৃথিবী) অচেতন। কিন্তু এখানকার বর্ণিত 'বসুন্ধরা' মেঠোসুরে বাঁশির কান্না শুনে 'উদাসী', 'হিরণ্য অঞ্চল বক্ষে' টেনে এলোচুলে বসে আছেন। বলা বাহুল্য, এ স্বভাব 'বসুন্ধরা'র নয়। ওই নারীই 'বসুন্ধরা'-র উপমান। উপমান 'নারী'কে চেনা যায় উপমেয় 'বসুন্ধরা'র ওপর আরোপিত আচরণের বর্ণনা থেকেই। অতএব, উপমেয়ের উপর উপমানের ব্যবহার আরোপের সৌন্দর্যই উদ্ধৃত স্তবকের অলংকার, সে অলংকারের নাম সমাসোক্তি।

১৬.৪.৬ অতিশয়োক্তি

সংজ্ঞা: বিষয়ীর (উপমানের) সিদ্ধ অধ্যবসায় হলে, অর্থাৎ উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললে এবং সেই কারণে উপমেয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তারই নাম সাধারণ অতিশয়োক্তি। উপমেয় লুপ্ত এবং উপমান প্রবল হলে অতিশয়োক্তি।

উপমেয়ের উল্লেখ না করে উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করার নামই হলো অতিশয়োক্তি। এই অলংকারে উপমেয় গ্রস্ত হয় আর উপমানের প্রাধান্য ঘটে। যদি বলা যায় যে 'মুখ থেকে অমৃত ঝরছে', তখন মধুর কথার সঙ্গে অমৃতের অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উপমেয় ''কথার''

উল্লেখ না করেই উপমান 'অমৃত' এসে হাজির হল, সুতরাং এটি অতিশয়োক্তি অলংকার। এখানে উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করে উপমানকেই যেন উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হল, তাই এটি অতিশয়োক্তি অলংকার।

বৈশিষ্ট্য:

১। উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না, অর্থাৎ উপমেয়ের লুপ্ত।

২। বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থেকে উপমেয়কে চেনা যায়।

৩। উপমান একা, সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৪। উপমেয়-উপমানের সাদৃশ্য এখানে চূড়ান্ত, অভেদ সম্পূর্ণ।

৫। 'উপমা'য় উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো, 'ব্যতিরেকে' ওই ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো, 'রূপকে' অসম্পূর্ণ অভেদ, 'অপহ্নুতি'-তে অভেদ মেনে নিয়ে উপমেয়ের অস্বীকৃতি, 'অতিশয়োক্তি'তে সাদৃশ্যের চূড়ান্ত পরিণাম—অভেদ সম্পূর্ণ।

উদাহরণ:

(ক) মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা!

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলের দিকে পা-বাড়ানো মেঘনাদের বিদায়-মুহূর্তের একটি করুণ দৃশ্য উদ্ধৃত উদাহরণটি। বেদনার্ত প্রমীলার ক্রন্দন-দৃশ্য। নয়ন থেকে অশ্রুধারাই তো বর্ষিত হল। কিন্তু অণু এখানে অনুক্ত। প্রমীলার নয়ন বা বর্ষণ করল, কবের চোখে তা 'মুকুতা'। তারই উল্লেখ এখানে আছে। অর্থাৎ, প্রকৃত বা উপমেয় 'অশু'-র উল্লেখ নেই, আছে কেবল অপ্রকৃত বা উপমান 'মুকুতা'র (মুক্তা) উল্লেখ। অতএব, অলংকার এখানে অতিশয়োক্তি (বিশেষ নাম 'রূপকাতিশয়োক্তি)।

(খ) হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে?

ব্যাখ্যা: বিধ্বংসী লঙ্কাযুদ্ধের জন্য রাবণ দায়ী করলেন সূর্পণখাকে। পঞ্চবটীবনে 'কালকূটে ভরা ভুজগ'টিকে দেখারই পরিণাম এ যুদ্ধ। কিন্তু, বিধ্বস্ত রাবণের দৃষ্টিতে যা 'ভুজগ' (সাপ), প্রকৃত অর্থে তিনি এখানে রামচন্দ্র। সূর্পণখা রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে দেখেই কামাসক্ত হয়ে রক্তারক্তি-কাণ্ডের সূচনা করেছিল, কোনো সাপ দেখে নয়। অতএব, 'ভুজগ' এখানে উপমা-মাত্র, তার উপমেয় 'রামচন্দ্র'।

বক্তার (রাবণের) মূল্যায়নে এবং কবির প্রকাশভঙ্গিতে উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং তাদের অভেদ এখানে পরিপূর্ণ। ফলে, বাক্যে উপমেয় 'রামচন্দ্র' পুরোপুরি লুপ্ত, উপমান 'ভুজঙ্গ' সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, উপমান সম্পূর্ণভাবে উপমেয়কে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং, এখানকার অলংকার অতিশয়োক্তি।

১৬.৪.৭ ব্যতিরেক

সংজ্ঞা: উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে যে অর্থ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যতিরেক অলংকার। উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে ব্যতিরেক। অনেক সময় এই উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারণের উল্লেখ থাকে, আবার অনেক সময় তা থাকে না।

বৈশিষ্ট্য:

১। উপমান অপেক্ষা উপমেয় উৎকৃষ্ট হয়ে পারে। তখন অলংকার হবে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

২। উপমান অপেক্ষা উপমেয় নিকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

৩। অধিক-চেয়ে-অপেক্ষা, নিন্দি-নিন্দিত-নিন্দু, জিনি-জিতল, গঞ্জি-গঞ্জন, লাজ-লজ্জা, ছার ইত্যাদি তারতম্যবোধক শব্দের প্রয়োগে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়।

৪। সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে থাকে।

৫। কখনো কখনো বর্ণনায় অন্তর্নিহিত থাকে উৎকর্ষ-অপকর্ষ, ভাব বা অর্থ থেকে তা বুঝে নিতে হয়।

৬। ব্যতিরেক অলংকারে উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে তাতে দেখানো হয়। এটি সাদৃশ্যের দ্বিতীয় স্তর। (প্রথম স্তর উপমায়, যেখানে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়।)

> রূপে গুণে রস সিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
> মালতীর মালা গলে দোলে।

শ্রীকৃষ্ণের মুখশ্রী চন্দ্রের লালিত্যকে ম্লান করেছে, জয় করেছে। মুখটা উপমেয়, ইন্দু উপমান। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণিত হয়েছে, তাই এটি ব্যতিরেক অলংকার।

ব্যতিরেক অলংকার দুরকমের। যখন উপমানকে নিন্দিত করে উপমেয়ের উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়—তখন তাকে **উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক** বলা হয়; এবং এই জাতীয় ব্যতিরেক অলংকারই হচ্ছে প্রধান, সাহিত্যে এরই প্রচলন বেশি।

আর যখন উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষ বর্ণিত হয়—তখন তাকে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক বলে; এই জাতীয় ব্যতিরেকের প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় না; কারণ উপমেয়ের অপকর্ষ বর্ণনা করে সাহিত্যীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির রেওয়াজ কম। তবে একেবারে যে নেই—তা নয়। নীচে এই দু'রকম ব্যতিরেকেই উদাহরণ দিয়েছি। তার আগে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই।

উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকারে প্রায়ই আমরা জিনি, গঞ্জি, লাঞ্ছন, ছার, নিন্দি বা নিন্দিত প্রভৃতি শব্দ দেখতে পাই। অনেক সময় অবশ্য ব্যতিরেক-জ্ঞাপক এই শব্দগুলি অনুপস্থিত থাকে—তখন অর্থ বুঝে বা বাচনভঙ্গীর তাৎপর্য অনুধাবন করে ব্যতিরেক অলংকার বুঝতে হয়।

১৬.৪.৭.১ উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক

উদাহরণ:

(ক) কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি' উপমান কলকল্লোল। এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ নেই, আছে তারতম্য-বোধক 'লাজ দিল' কথাটি—এর সাহায্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝা যাচ্ছে। উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি' লজ্জা দিল উপমান 'কলকল্লোল'কে। লজ্জা যে দেয়, সে তার শ্রেষ্ঠত্বকে বা উৎকর্ষের কারণেই দেয়। এখানে 'নারীকণ্ঠের কাকলি'রই উৎকর্ষ। কিন্তু, কোন্ গুণে এই উৎকর্ষ, সে কারণটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তা অনুমান করা যায়। কলধ্বনি নারীর কণ্ঠেও আছে, কল্লোলের (ঢেউ) মৃদু আঘাতেও আছে। এই ধ্বনির উচ্চতায় 'কলকল্লোল' অপেক্ষা নারীকণ্ঠের 'কাকলি'রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এ উদাহরণে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকার হয়েছে।

(খ) কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা।
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উপমেয় 'রাবণের রাজসভা' (ইহা), উপমান 'ইন্দ্রপস্থের পাণ্ডব-সভা'। দুটি সভাই ঐশ্বর্যময়। তবে, তারতম্য-বোধক 'ছার' শব্দের প্রয়োগে ঐশ্বর্যের পরিমাণের দিক থেকে দুটি রাজ্যসভায় উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে 'রাবণের রাজসভা'রই উৎকর্য। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এখানকার উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

১৬.৪.৭.২ অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক

পূর্বেই বলেছি— অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেকের সাক্ষাৎ বেশি পাওয়া যায় না; নীচে কয়েকটি এই জাতীয় ব্যতিরেকের উদাহরণ দিলাম—

(ক) দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু, ক্রমশঃ হইলে তনু
আর ত' নূতন নাহি হয়।

এখানে 'নরের তনু'—উপমেয়, আর 'শশধর' হলো উপমান। উভয়েই ক্ষীণ হয়—কিন্তু উপমান পুনরায় পূর্ণ জীবন পায়, অথচ উপমেয় আর নূতন হয় না; তাই উপমেয় অপেক্ষা এখানে উপমানের উৎকর্ষই প্রকাশিত হচ্ছে। উলটে বললে বলা যায় যে এখানে উপমেয়ের অপকর্ষ ঘটেছে তাই একে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক বলতে হবে।

(খ) ব্যবহারে সে নিতান্ত পাষণ্ডকেও হার মানায়।

পাষণ্ড উপমান আর 'সে' হচ্ছে উপমেয়। ব্যবহারে পাষণ্ড অপেক্ষাকৃত ভালো বলায় উপমানে উৎকর্ষ সূচিত হল।

১৬.৭ সারাংশ

অর্থালংকারে বাইরের রূপটি বড় নয়। শব্দের ধ্বনিগত উজ্জ্বলতায় এই অলংকার নিরূপিত হয় না। বাক্য বা শব্দের অর্থ অক্ষত রেখে শব্দ বদল করে দিলেও অলংকার যা ছিল, তাই থাকবে। কিন্তু শব্দ বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থটিও যদি বদলে যায়, তাহলে অলংকারটি আর টিকবে না। অনেক রকমের অর্থালংকার আছে। ওদের সাধারণ লক্ষণ দেখে যদি শ্রেণিবিভাগ করা যায় তবে পাঁচটা শ্রেণিতে ওদের ফেলতে হবে। যথা—সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক আর গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলংকার।

উপমা: সমধর্মবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোই উপমা বলে। উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ। উপমেয়—যার তুলনা দেওয়া হয়—তা হল উপমেয়। উপমান—যার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয় বা তুলনা করা হয়—তাই হচ্ছে উপমান। সামান্য বা সাধারণ ধর্ম—যে ধর্ম বা গুণ উপমেয় আর উপমানের মধ্যে থেকে তুলনাকে সম্ভব ও সফল করে তোলে তাকে সামান্য বা সাধারণ ধর্ম বলে। সাদৃশ্যবাচক শব্দ—মতো বা মতে, মতন, সম, যথা, নিভ, তুল, সমতুল, যেমন, জনু, যথা, যৈছে, প্রায়, পারা, উপমা, তুল্য, হেন, ন্যায়, জাতীয়, সদৃশ, সমান, যেন, প্রতিম, ভাতি, রীতি, সংকাশ, প্রমাণ, বৎ প্রভৃতি অব্যয়গুলিকে (যাদের দ্বারা উপমা বোঝায়) সাদৃশ্যবাচক শব্দ বলে। বাংলায় উপমার বিভাগ পাঁচটি—১। পূর্ণোপমা; ২। লুপ্তোপমা; ৩। মালোপমা; ৪। স্মরণোপমা; ৫। মহোপমা।

পূর্ণোপমা: যে উপমা অলংকারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা। **লুপ্তোপমা**: যে উপমা অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের যে কোনো একটি বা দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে, তার নাম লুপ্তোপমা।

মালোপমা: যে উপমা অলংকারে উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি, তার নাম মালোপমা।

স্মরণোপমা: কোনো বস্তুর স্মরণ বা অনুভব থেকে যদি সমধর্মের অন্য কোনো বস্তুকে মনে পড়ে যায় তবে স্মরণোপমা অলংকার হবে।

মহোপমা: মহোপমা ঠিক একটি অলংকার নয়। তাই অনেক আলংকারিক একে উপমার স্বতন্ত্র শ্রেণি বলে স্বীকার করেননি।

রূপক: বিষয়ের অপহ্নব না ঘটিয়ে তার ওপর বিষয়ীর (উপমানের) অভেদ আরোপ করলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম রূপক অলংকার। বাংলায় রূপকের উল্লেখযোগ্য বিভাগ তিনটি—(ক) নিরঙ্গরূপক; (খ) সাঙ্গরূপক; (গ) পরম্পরিত রূপক। এছাড়া আছে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক,

আখ্যানরূপক। তবে প্রথম তিনটি রূপকই প্রধান। নিরঙ্গরূপক দু-রকমের— (ক) কেবল নিরঙ্গরূপক; (খ) মালা নিরঙ্গরূপক। **নিরঙ্গরূপক:** যে রূপক অলংকারে কোনো অঙ্গের অভেদ কল্পনা না করে কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম নিরঙ্গরূপক। নিরঙ্গরূপক দুরকমের, কেবল আর মালা। একটি উপমানের অভেদ আরোপ হলে কেবল নিরঙ্গরূপক, আর একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ হলে মালা নিরঙ্গরূপক। **সাঙ্গরূপক:** যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম সাঙ্গরূপক। **পরম্পরিত রূপক:** যে রূপক অলংকারে একটি অলংকারে একটি উপমেয়ের ওপর একটি উপমানের অভেদ-আরোপের কারণে অন্য একটি উপমেয়ের ওপর অন্য একটি উপমানের অভেদ-আরোপের জন্ম হয়, তার নাম পরম্পরিত রূপক। **অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক:** উপমানে যদি কোনো বিশেষ কিম্বা অসম্ভব গুণ বা ধর্ম আরোপ করা হয়, এবং ঐ বিশেষ গুণ বা ধর্মযুক্ত উপমানকে যদি উপমেয়ের ওপর অভিন্নভাবে স্থাপিত করে রূপক সৃষ্টি করা হয়, তখন সেই রূপককেই অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক বলে।

উৎপ্রেক্ষা: গভীর সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতকে (উপমেয়কে) যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট (প্রবল) সংশয় হয় এবং যদি সে সংশয় কবিত্বময় হয়ে ওঠে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উৎপ্রেক্ষা অলংকার। উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু-রকমের—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। **বাচ্যোৎপেক্ষা:** যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'যেন', 'বুঝি', 'জনু', 'প্রায়', 'মনে হয়', 'মনে গণি' জাতীয় কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তার নাম বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা:** যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমান করে নেওয়া যায়, তার নাম প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। **মালোৎপ্রেক্ষা:** একই উপমেয়কে কেন্দ্র করে যদি একাধিক উপমানের দ্বারা একাধিক উৎপ্রেক্ষার মালা সাজানো হয় তবে তাকে মালোৎপ্রেক্ষা অলংকার বলে।

অপহ্নুতি: উপমেয়কে নিষিদ্ধ করে বা গোপন রেখে উপমানকে স্থাপন বা প্রকাশ করাকে অপহ্নুতি অলংকার বলে। **সমাসোক্তি:** বর্ণনীয় বিষয়ের (উপমেয়) ওপর অন্যবস্তুর (উপমান) ব্যবহার আরোপ করা হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সমাসোক্তি অলংকার।

অতিশয়োক্তি: বিষয়ীর (উপমানের) সিদ্ধ অধ্যবসায় হলে, অর্থাৎ উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললে এবং সেই কারণে উপমেয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তারই নাম সাধারণ অতিশয়োক্তি।

ব্যতিরেক: উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে যে অর্থ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যতিরেক অলংকার। ব্যতিরেক অলংকার দু'রকমের। যখন উপমানকে নিন্দিত করে উপমেয়ের উৎকর্য স্থাপন করা হয়—তখন তাকে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক বলা হয়; আর যখন উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষ বর্ণিত হয়, তখন তাকে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক বলে।

১৬.৮ অনুশীলনী

১. অর্থালংকার বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লিখুন।

২. সাদৃশ্যমূলক অলংকার কাকে বলে? ব্যাখ্যা করুন।

৩. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—অর্থালংকার অর্থেরই অলংকার, শব্দের (ধ্বনির অলংকার নয়।

৪. শব্দালংকার আর অর্থালংকারের মূল পার্থক্য কী কী লিখুন।

৫. অর্থালংকারের শ্রেণিগুলির নাম লিখুন।

৬. সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মূল ভাগ ক'টি? নামোল্লেখ করে বিস্তারিত লিখুন।

৭. কী কী উপায়ে কবিরা দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখান, উদাহরণসহ লিখুন।

৮. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন: পূর্ণোপমা, সাঙ্গ রূপক, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক।

৯. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।

(খ) নয়ন বর্ষিল উজ্জ্বলতর মুকুতা।

(গ) তটিনী চলেছে অভিসারে।

(ঘ) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গ।

(ঙ) অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।

(চ) কচি কলাপাতা সন্ধ্যা।

(ছ) জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই।

(জ) সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা।

(ঝ) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধারপর্ণপুটে।

(ঞ) ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে।

(ট) হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান

(ঠ) আসন্ন শীতের বেলা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে।

একক ১৭: বিরোধমূলক অর্থালংকার

একক গঠন:

১৭.১ উদ্দেশ্য

১৭.২ ভূমিকা

১৭.৩ মূলপাঠ: বিরোধমূলক অর্থালংকার

১৭.৩.১ বিরোধাভাস (বিরোধ)

১৭.৪ মূলপাঠ: ন্যায়মূল অলংকার

১৭.৪.১ অর্থান্তরন্যাস

১৭.৫ গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার

১৭.৫.১ ব্যাজস্তুতি

১৭.৬ সারাংশ

১৭.৭ অনুশীলনী

১৭.১ উদ্দেশ্য

এতক্ষণ আমরা দেখলাম, সাদৃশ্যমূলক অলংকারের নানা রূপ। দুটি সদৃশ বা বিসদৃশ বস্তুর সাদৃশ্য প্রদর্শন করে অর্থালংকারের বিবিধ রূপটি প্রকাশিত হয় সাদৃশ্যের চারটি অঙ্গের হেরফেরে। এবার আমরা দেখব অর্থালংকারের অন্য রূপ। এবার জেনে নিন অর্থালংকারের বাকি চারটি লক্ষণ থেকে তৈরি আরও তিনটি শ্রেণির কথা—বিরোধমূলক, ন্যায়মূলক আর গঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকারের কথা। এই এককটির উদ্দেশ্য তার পরিচয়টি বিশদ করা। এর ফলে শিক্ষার্থী অলংকার নির্ণয়ে অধিকতর স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন এবং অর্থালংকারের সার্বিক পরিচয় লাভ করবেন।

১৭.২ ভূমিকা

কোনো কবির লেখায় যদি দেখি, কার্য-কারণ-ঘটনাক্রম তার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অন্যপথ বা উলটোপথে চলছে, তখনই বুঝব সেখানে ‘বিরোধ’ আছে। যেহেতু তা কবির লেখা, সেই কারণে ধরে নিতে হবে—সেখানে যা-কিছু বিরোধ সবই বাইরে থেকে বিরোধ বলে মনে হয়, একটু তলিয়ে ভাবলেই তার মীমাংসা খুঁজে পাব, বিরোধ মিলিয়ে যাবে। কাব্য-কবিতার বিরোধের ব্যাপারটি কয়েকটি উদাহরণ থেকে বুঝে নেওয়া যাক:

১. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।

২. মেঘ নাই তবু অঝোরে ঝরিল জল।

৩. আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।

৪. তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

৫. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

৬. এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে বাঁধিতে গলায়?

প্রথম উদাহরণে আছে একটি শিশু আর শিশুর পিতা। শিশুটি তার পিতার কোলে ঘুমিয়ে আছে, এই তথ্য অভিজ্ঞ মানুষের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু, শিশুর পিতাটি ঘুমিয়ে আছে শিশুর মধ্যে—এ ধরনের কথায় মনে খটকা লাগে, অভিজ্ঞতা ধাক্কা খায় একটা বিপরীত ছবির কল্পনায়। পাঠককে ভাবায়, পাঠক কিছু সময়ের জন্য গভীর জলে পড়ে যায়, এর অর্থ খুঁজে বের করে অবশেষে কিনারা পায়। এটাই বিরোধ, এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার।

দ্বিতীয় উদাহরণে মেঘশূন্য নীল আকাশ থেকে অঝোরে বর্ষণ, তৃতীয় উদাহরণে চোখ থেকেও দৃষ্টি না-থাকা-কারণ-কার্যের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অস্বীকার করছে বলে বিরোধ। চতুর্থ উদাহরণে শ্রাবণের ধারা ঝরল একটি বনে, কদম ফুটল অন্য একটি বনে। এমন ঘটনা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আইন অমান্য করছে। অতএব, খবর হিসেবে এটি মিথ্যা, অন্ততপক্ষে অবিশ্বাস্য। বনে বনে সন্ধান করেও এর সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু ওই বিরোধের খোলসটা ছাড়িয়ে পাঠকের মনে যে কদম ফুটে উঠল ক্রমশ, তার সৌন্দর্য পাঠকই উপভোগ করবেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী তার আস্বাদ পাবেন না। পঞ্চম উদাহরণে সুখের আশায় বাঁধা ঘর আগুনে পুড়ে দুঃখ এনে দিল, বস্তুজীবনেও এমনটি ঘটে। এই স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেও তো বিরোধ আছেই। এই বিরোধটাই কবি কাজে লাগাচ্ছেন তাঁর কবিতায়, যেখানে সত্যি সত্যি ঘর-বাঁধা বা ঘর-পোড়ার ঘটনা ঘটছে না, ঘটছে কারো মনে সুখের বদলে দুঃখের আনাগোনা। শেষ উদাহরণের দৃশ্যটা অদ্ভুত এবং কিঞ্চিৎ ভয়ংকর। এমন সাপের কথা কবি বলছেন, যাকে দেখলে ভয় শিউরে ওঠার বদলে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে। খবর হিসেবে এটাও অবিশ্বাস্য। এখানেই এর বিরোধ। কেন সাপটাকে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে বুঝতে পারলেই চমক, চমৎকারিত্ব। গলায় বাঁধা ওই সাপটা সত্যি সত্যি হয়ে উঠবে অলংকার—গলারও, মনেরও।

১৭.৩ মূলপাঠ: বিরোধমূলক অর্থালংকার।

১৭.৩.১ বিরোধাভাস (বিরোধ)

সংজ্ঞা: যদি দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হয়, কিন্তু অর্থবোধে যদি সে বিরোধের অবসান ঘটে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার। দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখানো হলে বিরোধাভাস।

দুটি বস্তুর যদি আপাত বিরোধ দেখা যায় এবং ঐ বিরোধে যদি চমৎকারিত্বের বা কাব্যোৎকর্ষের সৃষ্টি হয়— তখনই বিরোধাভাস অলংকার হয়। এই অলংকার প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যথার্থ

বিরোধ হলে বিরোধাভাস অলংকার হয় না। বিরোধ এখানে শুধু উক্তিতে, অর্থ বা তাৎপর্যে এ বিরোধ নেই। যেমন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

এখানে সীমার মাঝে অসীমের স্থিতি আপাত বিরোধী চিন্তা, কিন্তু অসীম ঈশ্বর সীমিত বিশ্বও বিরাজমান। সুতরাং বিরোধ এখানে যথার্থ নয়, কাব্যে চারুত্ব দান করার জন্য উল্লিখিত। তাই এখানে বিরোধাভাস হয়েছে। সত্যকার বিরোধ থাকলে অলংকার কখনোই থাকে না। আরেকটা উদাহরণ দিই।

'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।'

কাদম্বিনী মরেনি—এই ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে দিলে; এটি আপাতবিরোধী। ভাষাগতভাবেও বিরোধ রয়েছে 'মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই'—মরে না-মরা কীভাবে প্রমাণিত হয়? গোটা গল্পটার আলোকে এর উত্তর সহজ, এবং বিরোধটুকুও যথার্থ নয়।

উদাহরণ:

(i) অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।।

ব্যাখ্যা: 'বন্ধন' আর 'মুক্তি' বিপরীত দুটি শব্দ। অতএব, 'বন্ধনমাঝে' 'মুক্তির স্বাদ' পাবার কল্পনায় বিরোধ আছে। কিন্তু 'বন্ধন' যদি হয় 'অসংখ্য' আর 'মুক্তির স্বাদ' যদি হয় 'মহানন্দময়', তাহলে সে 'বন্ধন' আর 'মুক্তি'র অন্য অর্থ অবশ্যই আছে। আমাদের চারপাশের সীমানার যে বন্ধন, তা বাইরের। সেই বাইরের বন্ধনে বাঁধা থেকেই কবি চেয়েছেন মনের মুক্তি। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার অনুভবে যে আনন্দের সন্ধান কবি পেতে চান, কবির পক্ষে সেইটেই হবে সীমার বাহ্য বন্ধনের থেকেও অসীম আনন্দলোকে সত্যকার মুক্তি। এই অর্থবোধ থেকেই 'বন্ধন'-'মুক্তির আপাত বিরোধের অবসান ঘটে বলে এখানে বিরোধাভাস অলংকার আছে।

১৭.৪ মূলপাঠ: ন্যায়মূল অলংকার

যখন কোনো বক্তব্যের মধ্যে ন্যায়বাচক উক্তি থাকে এবং উক্তির দ্বারাই বক্তব্যকে জোরালো করা হয় তখনই ন্যায়মূল অলঙ্কার হয়। এই জাতীয় অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাত্র দুটি অলঙ্কার—অর্থান্তরন্যাস এবং কাব্যলিঙ্গ। আমরা কেবলমাত্র প্রথমটি আলোচনা করব।

১৭.৪.১ অর্থান্তরন্যাস

সংজ্ঞা: সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার। সামান্যের দ্বারা বিশেষ অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্য যখন সমর্থিত হয় তখন এবং কাজের দ্বারা কারণ অথবা কারণের

দ্বারা কাজ যখন সমর্থিত হয়, তখন অর্থান্তরন্যাস হয়। সংস্কৃত আলংকারিকদের কেউ কেউ অর্থান্তরন্যাসকে 'বিশ্বব্যাপী' বলেছেন।

বৈশিষ্ট্য:

১। এ অলংকারের বিশেষ লক্ষণ সমর্থন।

২। সাধারণত দুটি বাক্য থাকে, দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যকে সমর্থন করে।

৩। একটি বাক্যে সামান্য (বা সাধারণ বিবৃতি) থাকলে অন্য বাক্যে বিশেষ, একটি বাক্যে কারণ থাকলে অন্য বাক্যে কার্য।

৪। দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের বিশেষের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের বিশেষ দ্বারা প্রথম বাক্যের সামান্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কারণের দ্বারা প্রথম বাক্যের কার্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কার্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের কারণের সমর্থন—সমর্থন এই চার রকমের হতে পারে।

উদাহরণ:

১। সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন—

হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্মতি।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত স্তবকে দুটি বাক্য। প্রথম বাক্যে আছে একটি বিশেষ বিবৃতি—মেঘনাদের কাকা ('পিতৃব্য') বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গে বাস করে ('হেন সহবাসে') বর্বরতা শিখিয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যে ব্যক্তি নিম্নরুচির মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করে (গতি যার নীচ সহ) তার নিজের রুচিও নীচেই নেমে যায় ('নীচ সে দুর্মতি')। দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত মানব-স্বভাবের এই সামান্য বা সাধারণ নিয়মটি সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত বিভীষণের বর্বর হয়ে যাওয়ার পরিণামকে। সমর্থনসূচক বাক্যাংশ 'বর্বরতা কেন না শিখিবে?' সমর্থনকে আরও জোরদার করে তুলেছে। অতএব, সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থন থাকায় স্তবকটিতে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে।

২. বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন—

এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত বাক্যদুটির প্রথম বাক্যে আছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যার বেশি বেশি আছে, সে আরও বেশি চায়। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি বিশেষ উদাহরণ—বাবুর মতো রাজারাই উপেনের মতো গরিবের ধন চুরি করে নেয়। স্পষ্টত, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ সত্যটি প্রথম বাক্যের অন্তর্গত সাধারণ সত্যকেই সমর্থন করছে। বিশেষের দ্বারা সামান্যের এই সমর্থন উদ্ধৃত স্তবকে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে।

১৭.৫ গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার

গূঢ় অর্থ (গূঢ়ার্থ) হচ্ছে কবিতার বা স্তবকের এমন অর্থ, যা লুকিয়ে থাকে শব্দ-বাক্যের আড়ালে। শব্দ-বাক্যের এক-একটা অর্থ থাকে, যা বোঝা যায় শব্দগুলি চেনা শব্দ হলেই। এই অর্থটা কথার বাইরের অর্থ। কিন্তু এই বাইরের অর্থে অনেক সময়ই কবির বক্তব্য ধরা পড়ে না, তখন কথাগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেখানে আসল বক্তব্য বা গূঢ়ার্থ লুকিয়ে থাকে অন্য আরেক বাচ্যার্থের আড়ালে সেখানেই এই গূঢ়ার্থমূল অলংকার হয়। এই জাতীয় অলংকারের মধ্যে ছটি অলংকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা, সূক্ষ্ম, অর্থাপত্তি, স্বভাবোক্তি এবং আপেক্ষ। আমাদের আলোচ্য কেবলমাত্র ব্যাজস্তুতি।

১৭.৫.১ ব্যাজস্তুতি

সংজ্ঞা: ভাষায় বা বাইরের অর্থে (বাচ্যার্থে) যাকে নিন্দা বা স্তুতি বলে মনে হয়, গভীর অর্থে (গূঢ়ার্থে) যদি তা যথাক্রমে স্তুতি বা নিন্দা বলে বোঝা যায়, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যাজস্তুতি অলংকার। নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি।

উদাহরণ:

১. নিন্দার ছলে স্তুতি—

(i) ভাঙ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।

ব্যাখ্যা: শিবকে নেশাখোর (ভাঙ্ খান) মাতাল (মত্ত) বলা হল। দুটি বিশেষণই নিন্দাসূচক। এ কথাও বলা হল, প্রতিটি বিষয়েই তার অসন্তোষ, অতৃপ্তি। কেবলমাত্র বেলপাতা (বিল্বদল) পেলেই তিনি খুশি। সুতরাং, সব মিলিয়ে যে চরিত্রটি প্রকাশ পেল, তা সাধারণভাবে অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু 'কেবল তুষ্ট বিল্বদলে' কথাটির গভীরতর তাৎপর্য এই, অন্তরের ভক্তিটুকু মিশিয়ে তাঁকে একটুখানি স্মরণ করলেই তিনি তুষ্ট। এ কারণে শিবের আর একটি নাম আশুতোষ। তুষ্ট হলে যেকোনো কাম্যবস্তু অতি সহজেই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব। এইখানেই তাঁর শ্রদ্ধেয় পরিচয়। বাক্যের নিন্দাসূচক ইঙ্গিত বাইরে থেকে পাওয়া গেলেও শিব প্রশংসিতই হলেন। নিন্দার ছলে স্তুতি প্রকাশ পেল বলে এখানকার অলংকার ব্যাজস্তুতি।

(i) বন্ধু! তোমরা দিলে নাক দাম
রাজ সরকার রেখেছেন মান!
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন।

ব্যাখ্যা: 'রাজ সরকার' (ইংরেজ সরকার) সত্যি যদি কবির লেখাকে অমূল্য সম্পদ (যার অসীম মূল্য) গণ্য করে থাকেন, তবে কবির পক্ষে অবশ্যই তা সম্মানের, শ্লাঘার বিষয় এবং এ আচরণ ইংরেজ সরকারের পক্ষে প্রশংসার বিষয়। তবে, এই অর্থটি উদ্ধৃত স্তবকের বাইরের অর্থ (বাচ্যার্থ)। এই বাইরের অর্থে অবশ্যই রয়েছে ইংরেজ সরকারের প্রতি কবির স্তুতি। কিন্তু এই বাচ্যার্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে পৌঁছলেই বোঝা যাবে কবি প্রতি ইংরেজ সরকারের প্রকৃত আচরণটি। 'অ-মূল্য' শব্দটি প্রয়োগ করে

(মূল্যহীন অর্থে) কবি ইঙ্গিত করলেন একটি তথ্যের দিকে—সরকার বিনামূল্যেই কবির লেখা সংগ্রহ করে নিয়েছিল ওগুলি বাজেয়াপ্ত করে। সরকারের এই আচরণ অবশ্যই নিন্দনীয়। গূঢ়ার্থে সেই নিন্দাই উচ্চারিত। অতএব, স্তবকটিতে রয়েছে ব্যাজস্তুতি।

নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা করার সার্থক উদাহরণের প্রসঙ্গে আমরা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থে দেবী অন্নদার আত্মপরিচয়টুকু স্মরণ করি।

(ক) অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সাথে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।

(নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা সূচিত হচ্ছে।)

অবশ্য স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বোঝাতে এই অলংকারের প্রয়োগ একটু বেশি হয়ে থাকে। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে এই জাতীয় ব্যাজস্তুতির একটি বিখ্যাত উদাহরণ হলো—"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, হে প্রচেতঃ!" এখানে পথের-বাঁধা সাগরকে মালা-পরিহিত রূপে কল্পনা করার মধ্যে নিন্দা করার ব্যঙ্গার্থই আছে। তাই একে ব্যাজস্তুতি না বলে ব্যঙ্গোক্তি বলাই বোধহয় সঙ্গত।

১৭.৬ সারাংশ

দুটি সদৃশ বা বিসদৃশ বস্তুর সাদৃশ্য প্রদর্শন করে অর্থালংকারের বিবিধ রূপটি প্রকাশিত হয় সাদৃশ্যের চারটি অঙ্গের হেরফেরে। এবার জেনে নিন অর্থালংকারের বাকি চারটি লক্ষণ থেকে তৈরি আরও তিনটি শ্রেণির কথা—বিরোধমূলক, ন্যায়মূলক আর গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকারের কথা।

বিরোধাভাস (বিরোধ): যদি দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হয়, কিন্তু অর্থবোধে যদি সে বিরোধের অবসান ঘটে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার।

ন্যায়মূলক অলংকার: যখন কোনো বক্তব্যের মধ্যে ন্যায়বাচক উক্তি থাকে এবং উক্তির দ্বারাই বক্তব্যকে জোরালো করা হয় তখনই ন্যায়মূলক অলঙ্কার হয়। এই জাতীয় অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—অর্থান্তরন্যাস। অর্থান্তরন্যাস—সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার: গূঢ় অর্থ (গূঢ়ার্থ) হচ্ছে কবিতার বা স্তবকের এমন অর্থ, যা লুকিয়ে থাকে। শব্দ-বাক্যের আড়ালে। যেখানে আসল বক্তব্য বা গূঢ়ার্থ লুকিয়ে থাকে অন্য আরেক বাচ্যার্থের

আড়ালে সেখানেই এই গূঢ়ার্থমূল অলংকার হয়। ব্যাজস্তুতি—নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি।

১৭.৭ অনুশীলনী

১. বিরোধমূলক অলংকার কাকে বলে? তার বৈশিষ্ট্য কী কী?

২. ন্যায়মূল অলংকারের বিশেষত্ব কোথায়? এই শ্রেণির একটি অলংকারের উদাহরণসহ সংজ্ঞা দিন।

৩. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—বিরোধাভাস, ব্যাজস্তুতি।

৪. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।

(খ) পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি।
আস্তে একটু চলনা ঠাকুর-ঝি।
** **
জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরি ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?

(গ) গাছে গাছে ফল, ফুলে ফুলে অলি—

(ঘ) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।

(ঙ) সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

(চ) 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।'

(ছ) ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।

(জ) অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।।

(ঝ) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

(ঞ) হে দূর হতে দূর, হে নিকটতম।

(ট) ভীষণ সুন্দর বৃদ্ধ শিশুদল।

(ঠ) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, হে প্রচেত!

একক ১৮ অলঙ্কার নির্ণয়

একক গঠন:

১৮.১ উদ্দেশ্য

১৮.২ ভূমিকা

১৮.৩ মূলপাঠ ১: অলংকার-নির্ণয়ের সূত্র

১৮.৪ মূলপাঠ ২: অলংকার-নির্ণয় পদ্ধতি

১৮.৫ সারসংক্ষেপ

১৮.৬ অনুশীলনী: অলংকার নির্ণয় করুন

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল, এত প্রকার অলংকারের মধ্যে প্রদত্ত উদাহরণের প্রকৃত অলংকারটিকে নিশ্চিত কীভাবে করা সম্ভব তার চর্চা করা। এর ফলে শিক্ষার্থী অনুসন্ধানী হবে, যুক্তিবাদী হবে এবং অলংকারের বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণার অধিকারী হবে।

১৮.২ ভূমিকা

অলংকার নির্ণয়ের পদ্ধতি জানার পরেও কিছু কিছু সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। প্রধানত তিন রকমের সমস্যা এইরকম—এক, একটি গোটা স্তবকে একরকমের অলংকার, অথচ স্তবকটির অংশবিশেষ পৃথক হয়ে গেলে তৈরি হয়ে গেলে তৈরি হতে পারে আর এক রকমের অলংকার। দুই, একই উদাহরণে একটি অলংকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে আর একটি অলংকার। তিন, একই উদাহরণে দু-তিন রকমের লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যদিও তার মধ্যে একটি লক্ষণই সঠিক এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা অলংকারটিই হবে সঠিক অলংকার। অলংকার একটি কবিতা বা স্তবকের সমগ্র শরীরে ছড়ানো থাকতে পারে, স্তবকের একটি অংশে—বাক্যে বা চরণে আবদ্ধ থাকতে পারে। কিন্তু একটি সমগ্র স্তবকের অলংকার আর তার একটি অংশের অলংকার এক হতে পারে, ভিন্নও হতে পারে।

এ কারণে প্রথমেই আমরা আলোচিত অলংকারগুলির মূল লক্ষণ চিনে রাখি।

১৮.৩ মূলপাঠ ১: অলংকার-নির্ণয়ের সূত্র

অলংকার	**মূল লক্ষণ**
অনুপ্রাস	স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি

সরল অনুপ্রাস	একটি বা দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত
বৃত্ত্যনুপ্রাস	একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণ
ছেকানুপ্রাস	একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার উচ্চারণ
শ্রুত্যনুপ্রাস	বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশ
আদ্যানুপ্রাস	পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি
অন্ত্যানুপ্রাস	দুটি পঙ্‌ক্তির শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি
সর্বানুপ্রাস	দুটি চরণের সর্বশরীরে অনুপ্রাস
মালানুপ্রাস	একাধিক অনুপ্রাস বাক্যে থাকে।
গুচ্ছানুপ্রাস	একের বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত
যমক	একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার উচ্চারিত
আদ্যযমক	পদ্যে চরণের আদিতে যমক
মধ্যযমক	চরণের মাঝখানে যমক
অন্ত্যযমক	পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে যমক
সর্বযমক	একটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উচ্চারিত
শ্লেষ	একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ
অভঙ্গ শ্লেষ	উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়
সভঙ্গ শ্লেষ	উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়
বক্রোক্তি	বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ না ধরে শ্রোতা অন্য অর্থ ধরলে
কাকু-বক্রোক্তি	বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির প্রশ্নবোধক বক্তব্যের উত্তর হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়
শ্লেষ-বক্রোক্তি	বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে
উপমা	সমধর্মবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় মধ্যে সাদৃশ্য
পূর্ণোপমা	উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ
লুপ্তোপমা	উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য এক বা একাধিক অঙ্গের লুপ্তি
মালোপমা	উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি
স্মরণোপমা	কোনো বস্তুর স্মরণ বা অনুভব থেকে সমধর্মের অন্য কোনো বস্তুকে মনে পড়া

মহোপমা	মহোপমা ঠিক একটি অলংকার নয়
রূপক	উপমেয় ও উপমানের অভেদ আরোপ
নিরঙ্গরূপক	একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ
কেবল নিরঙ্গরূপক	একটি উপমানের অভেদ আরোপ
মালা নিরঙ্গরূপক	একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ
সাঙ্গরূপক	উপমেয়-উপমান অঙ্গসমেত এক হয়ে যাওয়া
পরম্পরিত রূপক	এক উপমেয় ও উপমানের কারণে আর একটি উপমেয়-উপমানের জন্ম
অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক	উপমানে বিশেষ কিম্বা অসম্ভব গুণ বা ধর্ম আরোপ
উৎপ্রেক্ষা	উপমেয়কে উপমান বলে উৎকট সংশয়
বাচ্যোৎপ্রেক্ষা	কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ
প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা	সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমিত হয়
মালোৎপ্রেক্ষা	একটি উপমেয়, একাধিক উপমান
অপহ্নুতি	উপমেয়কে নিষিদ্ধ বা গোপন রেখে উপমানের প্রতিষ্ঠা
সমাসোক্তি	নির্জীব বস্তুতে সজীব বস্তু বা প্রাণীর গুণ আরোপ
অতিশয়োক্তি	উপমেয়ের উল্লেখ না করে উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করা
ব্যতিরেক	উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো
উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক	উপমানকে নিন্দিত করে উপমেয়ের উৎকর্ষ স্থাপন
অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক	উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষ
বিরোধাভাস (বিরোধ)	দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ কিন্তু অর্থবোধে সে বিরোধের অবসান
অর্থান্তরন্যাস	সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন
ব্যাজস্তুতি	নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা

১৮.৪ মূলপর্ব ২ : অলংকার-নির্ণয় পদ্ধতি

এবার শুরু হবে পরবর্তী ধাপ। লক্ষণগুলি মাথায় রেখে দেখুন, উদাহরণটি শব্দালংকার না অর্থালংকার? প্রথম কাজ উদাহরণের ধ্বনিগুলি নজর করা। স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি থাকলে

অনুপ্রাসের অন্তর্গত হবে। অনুপ্রাসের অনেকগুলি বিভাগ আছে। কোন্ বিভাগের অন্তর্গত সেটি বুঝতে হলে দেখুন একটি বা দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হলে হবে সরল অনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণ হলে হবে বৃত্ত্যনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার উচ্চারণ ঘটলে হবে ছেকানুপ্রাস। বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশ ঘটলে হবে শ্রুত্যনুপ্রাস। পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি হলে আদ্যানুপ্রাস। অন্ত্যানুপ্রাস হবে দুটি পঙ্‌ক্তির শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি হলে। দুটি চরণের সর্বশরীরে অনুপ্রাস থাকলে সর্বানুপ্রাস। একাধিক অনুপ্রাস বাক্যে যদি থাকে তবে মালানুপ্রাস। একের বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত হলে গুচ্ছানুপ্রাস।

অনুপ্রাস না থাকলে শব্দের প্রতি দৃষ্টি দিন। দেখুন, একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে কিনা। হলে যমক। অনুপ্রাসের নিয়মেই ভাগগুলির প্রতি দৃষ্টি দিন এবং বিভাগ নির্ণয় করুন। যমক না হলে খেয়াল করুন একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ হয়েছে নাকি। যদি তেমন হয়, তবে বুঝবেন ওটি শ্লেষ অলংকার। এতগুলি স্তর পেরিয়ে এবার দেখুন দু'জন বক্তার কথোপকথন আছে কিনা। যদি দেখেন, বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ না ধরে শ্রোতা অন্য অর্থ ধরেছেন, তবে সেটি হবে বক্রোক্তি অলংকার।

শব্দের কারুকাজ পেরিয়ে আসুন অর্থালংকারে। মনে রাখবেন, অর্থালংকারে পথ হারাবার সম্ভাবনা বেশি। তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রথমেই খুঁজে নিন সাদৃশ্যমূলক অলংকারের চারটি অঙ্গই আছে কিনা। সমধর্মবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হলে সেটি উপমা অলংকারের মধ্যে গণ্য হবে। এবার সংকেতসূচি স্মরণে রেখে কোন্ উপবিভাগের মধ্যে উদাহরণটি গণ্য হবে, সেটি দেখুন। মনে রাখুন, উপমেয় ও উপমানের অভেদ আরোপ হলে রূপক, উপমেয়কে উপমান বলে উৎকট সংশয় জন্মালে উৎপ্রেক্ষা, উপমেয়কে নিষিদ্ধ বা গোপন রেখে উপমানের প্রতিষ্ঠা হলে অপহ্নুতি, নির্জীব বস্তুতে সজীব বস্তু বা প্রাণীর গুণ আরোপিত হলে সমাসোক্তি, উপমেয়ের উল্লেখ না করে উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হলে অতিশয়োক্তি, উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে ব্যতিরেক অলংকার হয়।

এবার অর্থালংকারের তিনটি বিভাজন। দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হলেও অর্থবোধে সে বিরোধের অবসান ঘটলে বিরোধাভাস—এটি বিরোধমূলক অলংকার। সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন করা হলে অর্থান্তরন্যাস অলংকার—এটি ন্যায়মূলক অলংকার। আর সবশেষে নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা করা হলে হবে ব্যাজস্তুতি অলংকার—এটি গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার।

মনে রাখবেন, অলংকার-ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ব্যাখ্যাই আপনাকে পৌঁছে দেবে যথার্থ অলংকার-নির্ণয়ে। দ্বিতীয়ত, উদাহরণে একাধিক অলংকার থাকা অস্বাভাবিক নয়। একাধিক অলংকার থাকলে সেটি নির্দেশ করতে হবে।

সাদৃশ্যমূলক অলংকারে উপমেয়, উপমান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন আপনার

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিচারশক্তি। আমরা আশা করব, এতক্ষণ ধরে অলংকারের আলোচনায় আপনারা সংশয়মুক্ত হতে পেরেছেন। এবার অনুশীলন।

১৮.৫ মূলপর্ব ২: অলংকার-নির্ণয় পদ্ধতি

এই এককে অলংকার নির্ণয় পদ্ধতি, অলংকার নির্ণয়ের সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী অলংকার নির্ণয় করতে পারবে, চিহ্নিত করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা অনুশীলনী অংশে বেশ কতকগুলি উদাহরণ তুলে ধরেছি।

১৮.৬ অনুশীলনী: অলঙ্কার নির্ণয় করুন

১. আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।

২. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

৩. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

৪. হলুদ পাতার মত, আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মত ছেঁড়া-মেঘ আকাশের ধারে।

৫. যে মূহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে তব কিছু নাই।

৬. পড়ুক দুফোঁটা অশ্রু জগতের 'পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।।

৭. ওগো আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ—
তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানি,
কখনো জাফরানি।

৮. কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাপি।

৯. অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

১০. দূরে বালুচরে রোদ কাঁপে থর থর'
ঝিঁঝির পাখার চেয়ে সে তীব্রতর।

১১. কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ?

১২. কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে,
গগনের নীলগাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা বুদ্‌বুদ্‌
জোছনা সোনায় রাঙে!

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. শ্যামাপদ চক্রবর্তী: অলঙ্কার চন্দ্রিকা
২. জীবেন্দ্র সিংহ রায়: বাঙলা অলঙ্কার
৩. সুধীন্দ্র দেবনাথ: বাংলা কবিতার অলংকার
৪. শুদ্ধসত্ত্ব বসু: অলংকার জিজ্ঞাসা

NOTE

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....